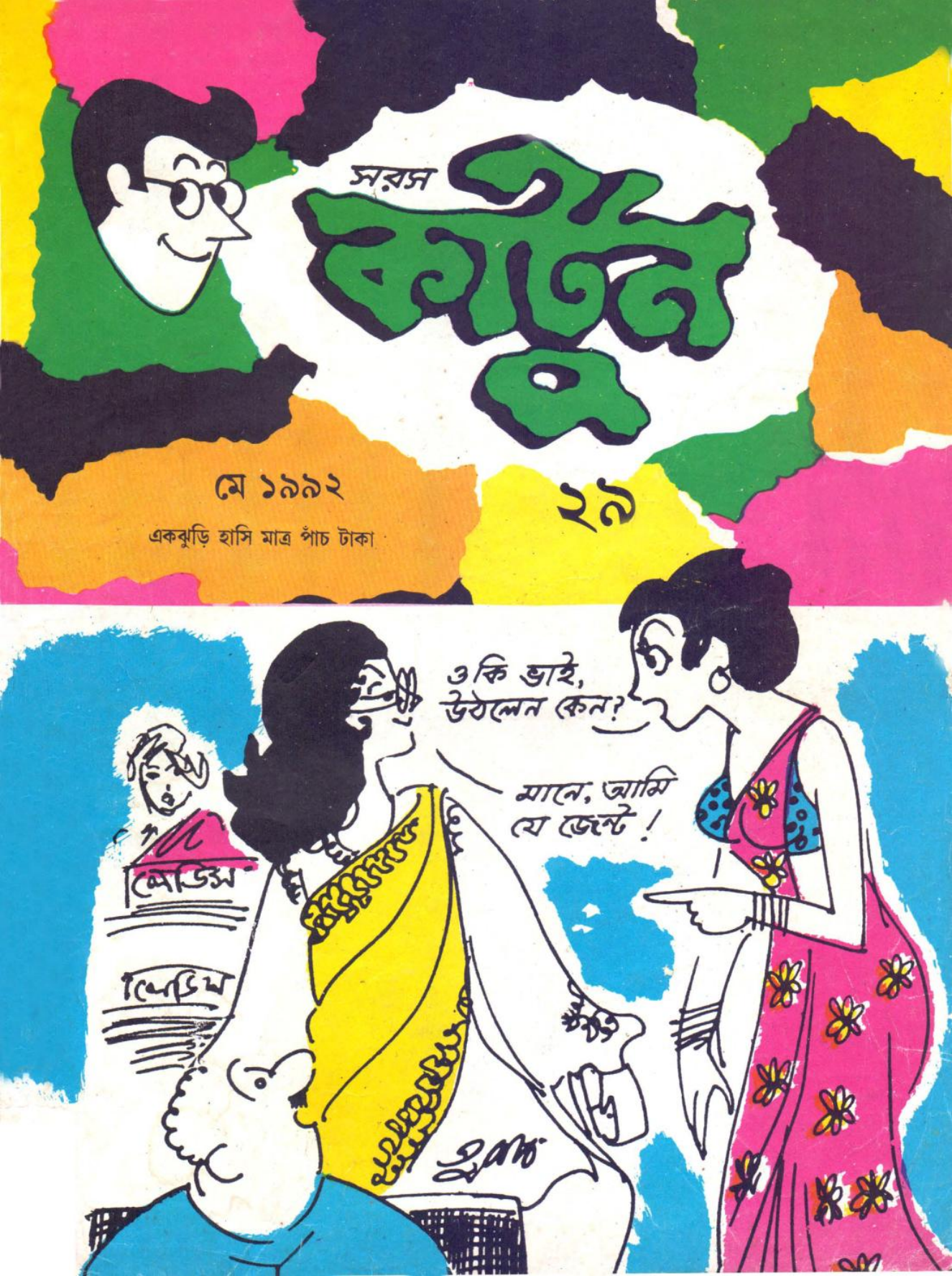

সরস

কার্টুন

মে ১৯৯২

২৯

একঝুড়ি হাসি মাত্র পাঁচ টাকা

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

হ্যাঁ ভাই, গদাইকে দেখেছো ?
কই না তো!
পরদিন সকালে
গদাইকে দেখেছো ভাই ?
না
কি হে পটলা, তোমার গদা কোথায় ?
রাতে শোবার সময়
হে ঠাকুর, গদাইকে ফিরিয়ে এনে দাও!
চলবে

বিরস বঙ্গের সরস কার্টুন

৬৯-জি, সেলিমপুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩১
ফোন : ৪৬-৫৭৪১

সম্পাদক : সুকুমার রায় চৌধুরী

তৃতীয় বর্ষ : পঞ্চম সংখ্যা : মে ১৯৯২

প্রেসের ভূত আমার ঘাড় না মটকে ভেতরের কভারের কার্টুন গল্পটাকে মটকে উল্টো পাল্টা করে দিয়েছে। আপনারাও উল্টে পাল্টে পড়ে নেবেন। মানে এপ্রিলের পরের অংশটা জুনে, তার পরেরটা মে '৯২ তে। এর পর প্রেসের ভূত থেকে সাবধান থাকব। —সম্পাদক।

ডিলাক্স নিরোধ

এখন পাওয়া যাচ্ছে গোলাপী রঙে

আপনার পরিবার সীমিত রাখবার জন্যে এক সঠিক জন্ম নিরোধক

davp.91/636 Ben.

সূচীপত্র

হাসির গল্প :

যোগ বিয়োগ : শ্যামল দত্তচৌধুরী ৪
পলাতক আসামী : অরবিন্দ ভট্টাচার্য ১৬

রম্যরচনা

পদাঘাতই শুধু পেলাম : সুনীল নস্কর ২২
বেগতিক বাতিক : প্রসূন মহারত্ন ২৭

অনুবাদ

ম্যাকবেথ হত্যা রহস্য : জেমস থারবার ১১
অনুবাদ : মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়

লঘু পাক

জন্মবৃত্তান্ত : সত্যবান মিত্র ২৮
কান্না হাসি : বরুণ কুমার সরকার ১০
হাসিটুন : নীহারুল ইসলাম ১০
হাসাহাসি : আব্দুল রফিক শেখ ২৬

ফিচার :

সরস দূরদর্শন : শ্রী দার্শনিক ৩০
পত্রাঘাত : শ্রী রসময় সর্বজ্ঞ ২০

ছড়ররর....রা

অন্নদা শঙ্কর রায়ের ছড়া ১৪
কমলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছড়া ১৫

পূর্ণপৃষ্ঠা কার্টুন

বাংলাদেশের কার্টুন : আহসান হাবিব ১৯

এবার কার্টুন এঁকেছেন :

পার্থ মিত্র (ডাকু), শতদল ভট্টাচার্য, প্রণব ভট্টাচার্য কাজী, রজত সরকার, শুভাশিস রায়, সুকুমার রবীন ভট্টাচার্য, চঞ্চল রুদ্র, সোমনাথ চ্যাটার্জি অলোক দাশগুপ্ত, বিজি ও অমল চক্রবর্তী।

অলংকরণ :

পার্থ মিত্র (ডাকু), সুকুমার রায়চৌধুরী

প্রচ্ছদ : সুকুমার রায় চৌধুরী
প্রচ্ছদের কার্টুন : তুষার চ্যাটার্জি (তুকাচ)

জেনে রাখুন

'সরস কার্টুন'প্রতি ইংরেজী মাসের গোড়াতেই বেরিয়ে যায়। দাম সাধারণ সংখ্যা পাঁচ টাকা। **পূজা সংখ্যা সহ** বার্ষিক গ্রাহক মূল্য সডাক পঁচাশি টাকা। আর **পূজা সংখ্যা বাদে** সডাক পঞ্চাশ টাকা। এক বছরের কমে গ্রাহক করা হয় না। অন্যান্য সংখ্যা সাধারণ বুক পোস্টে এবং পূজা সংখ্যা রেজিস্টার্ড বুক পোস্টে পাঠানো হবে। গ্রাহক মূল্য মানি অর্ডার অথবা 'সরস কার্টুন'এর নামে ব্যাঙ্ক ড্রাফটে নীচের ঠিকানায় পাঠাবেন। কোন্ সংখ্যা থেকে পত্রিকা নিতে চান তা উল্লেখ করে পুরো নাম ও পিনকোড সহ পুরো ঠিকানা লিখে, এই সংখ্যায় ছাপা "গ্রাহক ফর্ম"টি পাঠিয়ে দিন।

●

সত্যিকারের রসোত্তীর্ণ হাসির লেখা কপি রেখে কাগজের এক পিঠে লিখে পাঠাতে পারেন। ভাল হলে সুবিধামত কোনও সংখ্যায় বিনা পারিশ্রমিকে ছাপা হবে এবং সৌজন্য সংখ্যা পাঠানো হবে। ব্যক্তিগত পত্রালাপ করা হবে না এবং অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেওয়া যাবে না।

●

কার্টুন চাইনিজ ইঙ্কে এঁকে পাঠাতে পারেন। মাপ চওড়ায় ২, ৪ বা ৬ ইঞ্চি। উচ্চতা ৩ ইঞ্চি। ভাল হলে বিনা পারিশ্রমিকে কোনও সংখ্যায় ছাপা হবে এবং সৌজন্য সংখ্যা পাঠানো হবে। ব্যক্তিগত পত্রালাপ করা হবে না এবং অমনোনীত কার্টুন ফেরৎ দেওয়া যাবে না।

●

এজন্টেরা অগ্রিম দাম পাঠালে রেল, ডাক বা বিমানে অনুরোধ মত পত্রিকা পাঠানো হবে। শর্তাবলীর জন্য লিখুন।

●

৬৯-জি, সেলিমপুর রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩১
ফোন : ৪৬-৫৭৪১

শ্যামল দত্তচৌধুরী

যোগ বিয়োগ

মানিক অনেকদিন আগে তার প্রেমিকার বদলে ভুল করে প্রেমিকার বাবার কানে আচমকা 'ইয়াহু' বলে চেঁচিয়ে দেশান্তরী হয়েছিল। তারপর কয়েকটা বছর পার হয়ে গেছে। আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম যে, যাক শেষপর্যন্ত ও বোধ হয় সাধু হয়েই রয়ে গেল হিমালয়ে। সমাজ নিঃসঙ্গ হয়ে উঠছিল, মেয়েদের বাবারা আবার দৃঢ় পদক্ষেপে রাস্তায় বেরোতে আরম্ভ করেছিল।

একদিন শোনা গেল মানিক ফিরে এসেছে।

সন্ধ্যাবেলায় ওদের বাড়িতে গেলাম খোঁজ নিতে। মানিকের দরজায় আস্তে ঠেলা দিতেই খুলে গেল। দেখলাম একটা প্রাণী মাটিতে কেমন যেন অদ্ভুত অবস্থায় হাতে-পায়ে গিঁট লেগে পড়ে আছে। আমি আর্তনাদ করে উঠলাম।

তখন মানিক ধীরে-সুস্থে সেই জটিল বাঁধা থেকে নিজেকে মুক্ত করে ক্রুদ্ধভাবে তাকাল আমার দিকে। বললে, ওরকম বিকট চেঁচালি কেন? জানিস, আমার ব্রহ্মতালু ড্যামেজ হতে পারতো? মেরুদন্ড বেঁকে যেত? আমরা সাধুরা যখন যোগাসন করি তখন কখনো অমন বাজখাই চেঁচাবি না। নেহাৎ তুই আমার অনেক দিনের বন্ধু, অন্য কেউ হলে তক্ষুনি তাকে অভিশাপ দিয়ে দিতাম আর তার অষ্টাবক্র ছেলে হত। তুই বেঁচে গেলি। ওঁ।

আমি বললাম, তুই হিমালয় থেকে চলে এলি কেন রে? ঠান্ডা বলে?'

নারে, লছমনঝোলায় এক সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়ে আমি যোগসাধনা করছিলাম। তারপর... তারপর... মানিক একটু ইতস্তত করল, তারপর কোনো কারণে আমি ফিরে এসে আবার সংসারধর্মে প্রবেশ করব ভাবছি।

'তাই নাকি'? আমি বললাম তুই বিয়ে করবি? সেই ছন্দাকেই তো! এই তো সেদিন দেখা হয়েছিল, বলল ওর বাবা নাকি এখন আর বাঁ কানে কিছুই শুনতে পান না। সেদিনই তিনি কার সঙ্গে যেন মিনিট দশেক টেলিফোনে গল্প করেছেন ছন্দার মামা ভেবে। পরে জানা গেল

সেটা রং নাম্বার। তা, ছন্দাকেই বিয়ে করতে পারিস। তোর কথা জিজ্ঞেস করছিল আর সেই সময় পাশেই একটা চলন্ত কুকুরকে লাথি কষালো। মনে হল ও তোকে খুব ভালবাসে।'

মানিক গম্ভীর হয়ে মৎস্যাসন করল। তারপর বললে। বিবাহে আমার মত নেই। ছন্দা সুখী হোক।' এবার ঘরের চারিদিকে সতর্ক চোখ বুলিয়ে মানিক আবার বলল, অমিতাভ, আমি ইদানিং একটু দুশ্চিন্তায় আছি। স্বামী কেবলানন্দকে চিনিস? চিনিস না? ইনি লছমনঝোলায় আমায় দীক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর আশ্রমে থেকেই আমি যোগসাধনায় মোক্ষের পথে এগোচ্ছিলাম। এই স্বামী কেবলানন্দই এখন আমাকে তাড়া করে ফিরছেন।'

'তার মানে?'

তার মানে, মানিক কিছুক্ষণ বজ্রাসন করে বলল, বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। তবে শোন—

আমি গুরুর খোঁজে চষে বেড়াচ্ছিলাম সারা ভারতবর্ষ। মনের মত গুরু আর পাই না। অনেক বড় বড় মোটা সাধুর সঙ্গে দেখা হল— আমি টোটাল প্রায় এগারোজন সাধুর শিষ্যত্ব করেছি। ভূপালের জঙ্গলে ডাকসাইটে লোমশবাবার আশ্রমে আমি কিছুকাল কাটিয়েছি। এই সাধু বারো বছর পরে কুম্ভমেলার দিন স্নান করতেন।

স্নান করার দিন হৈ-চৈ সোরগোল হত, ঢাক-ঢোল বাজতো। দূর দূর থেকে ভক্তেরা সমবেত হতেন গুরুর স্নানের দিন উপস্থিত থাকার জন্যে। শিষ্যেরা তাঁকে বেষ্টনি করে সান্ত্বনা দিতে দিতে ঠান্ডা নদীর দিকে টেনে নিয়ে যেতেন। নদীর কিছুটা দূরে এক শ্যামলী তরুর মূলে গুরুর জন্যে নতুন বস্ত্র রাখা হতো। তিনি জলে পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে বলিষ্ঠ পায়ে হেঁটে গিয়ে সেই নতুন কাপড় পরিধান করতেন। এই সময়টুকু সমবেত শিষ্য এবং ভক্তরা চোখ বুঁজে থাকতেন— সবাই জানতো তাঁরা ধ্যান করছেন, কিন্তু আমার ঘোর

সন্দেহ আছে যে আসলে তাঁরা ঐ লোমশবাবাকে ঐ অবস্থায় দেখতে চাইতেন না। লোকমুখে শোনা যায় যে একবার একটা নিরীহ ভাল্লুক গুরুকে দেখে ফেলেছিল— তাতে নাকি বেচারা ভাল্লুকটার সমস্ত লোম চমকে খাড়া হয়ে গিয়েছিল এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা বলে যে এখন অন্য ভাল্লুকরা তার সঙ্গে মেশে না, তাই সে সজারুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়।

সেদিন হয়েছে কি, স্নানের সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম ছন্দার কথা ভাবতে ভাবতে। জলের স্রোতে আমার কাপড় ভেসে চলে গেল। প্রচন্ড ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে কোমর জলে দাঁড়িয়ে ভাবছি কি করা যায়। জনতা তখন চোখ বুঁজেছে লোমশবাবা উঠবেন বলে। সাধুও উঠেছেন, সেই সুযোগে আমিও উঠেছি। আর উঠেই চপলগতিতে দৌড়েছি শাখালী তরুর দিকে। সাধু ডাকছেন— তিষ্ঠ, তিষ্ঠ। কে শোনে তার কথা। সেই নতুন বস্ত্র পরে হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। সাধু এসে আমার কাপড় ধরে টানাটানি করতে লেগেছেন। আমিও সবলে ধরে রেখেছি আর বলছি— এই কি হচ্ছে কি অসভ্যর মত। ওদিকে ততক্ষণে শিষ্যরা ঢাক-ঢোল কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে বন্দনা গান গাইতে গাইতে এসে হাজির। প্রথমে দূর থেকে আমাকে গরিলা ধরেছে ভেবে তারা ইট-পাটকেল ছুঁড়তে লেগেছিল। পরে সাধুর আর্তনাদে তারা দাঁড়ালো এবং লোমশবাবার পিছনে কয়েকজন অল্পবয়স্ক শিষ্য নিম্নগলায় হাসল।

এরপর বুঝতেই পারছিস্ এই সাধুর আশ্রমে আর থাকা গেল না। এরকম ছোটখাটো দুর্ঘটনার জন্যে কোনো গুরুর

সান্নিধ্যেই আমি বেশী দিন কাটাতে পারি নি। তুই একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিস কিনা জানি না সাধুরা ভীষণ আনস্পোর্টিং ধরনের হয়। তুই আমি যেসব ঘটনাকে তুচ্ছ বলে হেসে উড়িয়ে দেব ওরা সেগুলোকেই বড্ড সিরিয়াসভাবে নেয়। আরেকবার সাহাবানপুরে প্রখর শীতে মোটে একটা কম্বল জড়িয়ে আমার ঘুম আসছিল না কিছুতেই। তা গুরু তো সূর্যেরই অংশ তিনি নিজ তেজে জ্বলবেন এই ভেবে আলগোছে তাঁর কম্বলটা টেনে নিয়ে নিজের গায়ে দিয়ে ঘুমোলাম। পরদিন সকালে দেখি তিনি জমে প্রায় বরফ হয়ে গেছেন, শুধু ঠোঁট নড়ছে। কান পেতে শুনলাম তিনি আমাকে যাচ্ছেতাই সব হিন্দি গালাগালি দিচ্ছেন।

যে এগারোজন সাধুর কাছে আমি শিষ্যত্ব করেছি সবজায়গাতেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করতাম। কয়েকদিন আমি প্রাণ ঢেলে সেবা করার পরে তাঁরা কেমন যেন পাল্টে যেতেন— আমাকে আড়চোখে দূর থেকে দেখতেন। আমি কাছে যেতেই সহসা সমাধিগ্রস্ত হয়ে পড়তেন আর মাঝে মাঝে একচোখ খুলে পরীক্ষা করতেন আমি তখনো রয়েছি কিনা। ওঁদের এই ব্যবহার আমাকে খুব আহত করত।

এই পর্যন্ত বলে মানিক একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সর্বাঙ্গাসন করল। একটু পরে বললে— শেষ পর্যন্ত আমার গুরু স্বামী কেবলানন্দের দেখা পেলাম লছমনঝোলায়। ভাগীরথীর উপরে ঝোলানো পোল পেরিয়ে আমি ওপারে গিয়ে চিন্তাকুল মনে একটা ঝোপের মধ্যে বিশ্রাম করছিলাম। শান্ত নিরালা তপোবন।

আমি কলকাতার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে ছন্দাকে দেখলাম। দেখলাম আমরা দুজনে যেন হাত ধরাধরি করে চিড়িয়াখানায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। গন্ডারের এলাকায় গিয়ে দেখি এটাকে একেবারে ছন্দার বাবার মত দেখতে। বেচারার আবার বাঁদিকের কানটা নেই— এই এককান কাটা গন্ডারকে দেখতে খুবই ভিড় হয়েছে। সবাই তাকে ঢিল ছুঁড়ছে। হঠাৎ সেটা আমাকে দেখতে পেয়ে লাফিয়ে পরিখা পার হয়ে পাঁচিল টপকে আমার বুকে চেপে বসল। আমি হাঁসফাঁস করতে করতে দম বন্ধ হয়ে জেগে উঠলাম। আমার শরীরে কালঘাম ছুটে গেছে।

চোখ খুলে দেখি আমর বুকের উপরে পদ্মাসন হয়ে কে বসে আছে। আমি তো ছন্দার বাবা ভেবে ভয়ে কেঁদে ফেলেছিলাম! আমার নড়াচড়ায় লোকটা

অবাক হয়ে তাকালো, তারপর নেমে বসে বলল, 'ও আমি শবদেহ ভেবেছিলাম। আমি স্বামী কেবলানন্দ।'

আমি করজোড়ে বললাম বাবা আমার ঘাট হয়েছে। আপনার ধ্যানভঙ্গ করেছি, অপরাধ ক্ষমা করুন।'

তিনি বললেন, তথাস্তু। তোমার শতপুত্র হোক।'

না, না, আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, আমাকে আপনার শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন। আপনি এলেন কোথা থেকে?'

তিনি বললেন, মানসসরোবর থেকে আমি খেচরীমার্গে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেছিলাম। পথে তোমার শবদেহ মনে করে বিশ্রামের নিমিত্ত নেমেছি।

তিনি আমাকে শ্মশানের কাছে নিয়ে দীক্ষিত করলেন। শ্মশানের পাশে একটা শমীবৃক্ষের নীচে আমরা বসবাস করতে লাগলাম তন্ত্র সাধনায় সুবিধার জন্যে। দিনের বেলা গ্রামে যেতাম ভিক্ষা করতে। গুরুজী একটু ভোজনরসিক ধরনের। আমি যখন করুণস্বরে ডাকতাম, ফ্যান দাও মা ফ্যান দাও, তিনি গম্ভীরস্বরে বলতেন দেরাদুন রাইস্ দাও মা, দেরাদুন রাইস্ দাও। তিনি বললেন যে একবার তিনি ম্লেচ্ছদেশ ইংল্যান্ডের উপর দিয়ে অন্তরীক্ষপথে উত্তর মেরুতে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি স্বকর্ণে শুনেছেন যে ওখানকার ভিক্ষুকরা বলে, গিভ মি কেক, মাদার, গিভ মি কেক।'

এমনি করে দিন যায়। আমি কুলকুন্ডালনী জাগ্রত করার চেষ্টায় লেগে আছি আর গুরুর সেবা করে যাচ্ছি। তিনি সন্ধ্যেবেলা কারণ পান করে সারারাত সেই শমীবৃক্ষের মগডালে আটকে, মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়ে নিদ্রা যান। আমিও একটু দূরে মাটিতেই শুই— যাতে তিনি পড়ে গেলে আমার গায়ে না লাগে। দক্ষিণদিকে যাওয়া আপাতত বন্ধ রেখেছেন। আমাকে খুব স্নেহ করেন, বলেছেন আমাকে উচ্চমার্গে পৌঁছে দিয়ে তবেই তিনি নিশ্চিন্ত হবেন।

কিন্তু একদিন আমাদের এই

নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাত্রায় তোলপাড় করে বয়ে গেল। গুরুজী গীতাভবনের দিক থেকে ধীর পায়ে কেমন যেন বজ্রাহত অবস্থায় ফিরে এলেন। তাঁকে দেখেই আমি শবদেহ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম কিন্তু তিনি আসনগ্রহণ করলেন না। মরার খুলিতে কারণ এগিয়ে দিলাম তিনি ছুঁলেনও না। শেষে রাত বাড়লে যখন তিনি বিষণ্ণমুখে চাঁদের দিকে তাকিয়ে ক্রমাগত ভুজঙ্গাসন করতে লাগলেন তখন একটা আবছা সন্দেহ আমার মনে জমে উঠতে লাগল। এবং রাত দ্বিপ্রহরে যখন তিনি জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ধুতরো ফুল কোঁচড় ভরে এনে মালা গাঁথতে বসলেন তখন আমি স্থিরনিশ্চিন্ত হলাম। গুরুদেব প্রেমে পড়েছেন

পরে জানতে পারলাম ঘটনাটা।

স্বামী কেবলানন্দ রোজকার মতই ভিক্ষা সেরে ফিরছিলেন। পথে হঠাৎ তার চোখে পড়ল একটি সদ্যস্নাতা যুবতী ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে চলেছে। জিতেন্দ্রিয় গুরুদেব মোহাবিষ্ট হয়ে পড়লেন।

সত্যি কথা বলতে কি, সত্য ত্রেতা যুগে বাঘা বাঘা সব ঋষিরা ইন্দ্রত্ব লাভের তপস্যা ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ যেসব কান্ড করে ফেলতেন যার জন্যে ভারতবর্ষ দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্যের মত মহাবীরদের পেয়েছে। আজকাল দিন পাল্টে গেছে— তাই রাশিয়া-আমেরিকা এত শক্তির বড়াই করে। তুই তো জানিস্ স্কুলে অনেক ইতিহাস ঘেঁটে আমি প্রমাণ করেছিলাম দুর্বাসার ঔরসে মেনকার গর্ভজাত পুত্র পুরুরবা তার পুত্র শুশুক, তার পুত্র শ্বেতকেতু, তার পুত্র অশ্বিবান তার পুত্র জমন্তক, তার পুত্র লুপ্তকর্ণ, তার পুত্র মিনিবাস। ইনি পশ্চিমে যাত্রা করেন। সেখানে তাঁর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেণ লোহিতকেশ, তার পুত্র মুন্ডিতমস্তক, তাঁর পুত্র নেবুক্যাডনেজার, তার পুত্র মেগলোম্যানিয়াক যাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মহাবীর আলেকজান্ডার। সুতরাং আলেকজান্ডার যে পৃথিবী জয় করবে এতো জানা কথা।

কলিযুগের মেয়েরা বড়ই গোপনস্বভাব। সাধুদের একদম তারা আমল দিতে চায় না। স্বামী কেবলানন্দ এই মেয়েটির কাছে গিয়ে অবনতমস্তকে কেবল প্রেম নিবেদন করলেন। এর পরের ঘটনা গুরুজী মনে হল চেপে যাচ্ছেন আমার কাছ থেকে। তবু তাঁর কালশিটে পরা চোখ সামনের সারির অনুপস্থিত দুটো দাঁত আর ছিন্নভিন্ন দাড়ি সেই দুরন্ত সময়ের নীরব সাক্ষী।

মেয়েটি কিন্তু তাঁকে ভয়ানক বশ করে ফেলেছে বুঝতে পারলাম। গুরুদেব তাকে মনে প্রাণে ভালবেসে ফেলেছেন এবং আফশোষ করছেন যে তাঁর বয়েস পঁচিশ বছর কম হলে আর গায়ে ছাই মাখা না থাকলে ঐ মেয়েটিকে তিনি নিমেষে মুগ্ধ করতে পারতেন।

স্বামী কেবলানন্দের কথা ভাবতে ভাবতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙলে দেখি কাছেই গুরুজী মাটিতে শুয়ে আছেন, চোখ নিমীলিত, আর তাঁর পাশে বসে একটা সুদর্শন যুবক সিগারেট খাচ্ছে। আমায় জাগতে দেখে বললে, এত দেরী করলে যে? যাও অচমন করে শুচি হয়ে পূর্বদিকে মুখ করে সূর্যস্তোত্র পাঠ কর।

আমি পাশ ফিরে শুয়ে বললাম গুরুদেব এখনো ঘুমোচ্ছেন। তিনি না

উঠলে আমি উঠি কি করে? যাও যাও নিজ কাজে।'

সে দাঁড়িয়ে রেগেমেগে সিগারেট ফেলে বললে, তুমি দেখছি বড়ই উদ্ধত।'

তারপর শার্টের তলে হাত ঢুকিয়ে খুঁজে না পেয়ে ঘুমন্ত গুরুদেবের পৈতে ছুঁয়ে বলল, দেব দেব অভিশাপ? জানো, অমনি তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হবে? হবে? হবে?

এতক্ষণে আমারও রাগ হয়ে গেছে, বললাম, তুমি কে হে ছোকরা? সক্কাল বেলা এসে একই কথা বারবার বলছো?'

সে গুরুদেবের পৈতে হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর হাস্য করে বলল, 'ওঃ হো, তুমি আসলে আমাকে চিনতে পারনি! অবশ্য ভুলটা আমারই। আমিই তোমার গুরু শ্রীমৎ স্বামী কেবলানন্দ। প্রণাম কর।'

আমাকে নিঃশব্দ দেখে ফের বললে, বুঝতে পারলে না?'

আমি বেশ স্পষ্টবাদী। বললাম, না।'

'হুঁ আমিও তাই ভেবেছিলাম। আমি মানে আমার আত্মা আমার, আর আমার দেহ আমার নয়। অর্থাৎ আমার দেহে এখন আমি নেই, মানে আমি আছি কিন্তু আমাতে নেই, অন্যতে আছি। বুঝলে?'

আমি বললাম, হ্যাঁ।'

ছেলেটা ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, কি বুঝলে? আমাকে বল।'

আমি বিপদে পড়ে বললাম,আসলে আমি বুঝিনি। ভেবেছিলাম হ্যাঁ। বললে তুমি এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাবে।

'দাঁড়াও, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ঐ যে যাকে গুরুদেব ভাবছো সেটা হল গুরুদেবের শরীর। ওর মধ্যে আত্মা নেই। আর আমার এই যে সুপুরুষ শরীর এটা অন্যের থেকে ধার নিয়েছি। এই দেহের ভিতরের আত্মাটা আমার— মানে তোমার গুরুদেবের। বুঝেছো?'

'কিন্তু একি ইয়ার্কি নাকি? আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, এ সব তো শঙ্করাচার্যের আমলে হতো?'

সে মিটিমিটি হাসল, 'হয় হয় সব হয়। যোগবলে সবই সম্ভব। এই ছেলেটি— মানে এখন আমার শরীরের পুরোনো মালিকের কথা বলছি— দাঁড়িয়েছিল সেই মেয়েটির বাড়ির সামনে, সেই মেয়েটি যে আমার হৃদয় এবং দুটো দাঁত হরণ করেছে। আমি ছেলেটির দৃষ্টিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যোগাসনে তার শরীরে প্রবিষ্ট হলাম। আমার মরদেহ যোগনিদ্রায় এখানে শায়িত হয়ে রইল।'

'কিন্তু সেই ছেলেটির আত্মা কি হল? সে কোথায়?'.

'সে সুখে আছে। আমি বরদান করতে চাইলে সে বলল যে বোম্বাইতে অভিনেত্রীদের নাকি তার অদৃশ্য হয়ে দেখার আকাঙ্খা আছে। তাই সে আমাকে প্রণাম করে বোম্বাইয়ের দিকে চলে গেল। যাই হোক, আমি তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি আমার দেহ পাহারা দাও। আমি কার্য সমাপন করে এসে অধিষ্ঠান করব। শান্তি, শান্তি, শান্তি।ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ— আমার গুরু প্রায়ই বলতেন।'

এই বলে আমার যুবক গুরুদেব আমায় আশীর্বাদ করে সিগারেট টানতে টানতে চললেন একটু দূরে গিয়েই ফিরে এসে বললেন, 'আমার মানে আমার ঐ শরীরের পৈতে খুলে দাও আমাকে। নইলে অভিশাপ দেবার সময় মুশকিলে পড়তে হবে।'

তিনি চলে গেলে আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম।

তারপর দিন যায়। গুরুদেব ফেরেন না। তাঁর দেহ ঘিরে বড় বড় ঘাস গজাতে লাগল। সেটা রোদে পোড়ে শীতে জমে যায়, বৃষ্টিতে ভেজে। মাথায় পাখিরা বাসা বেঁধেছে। আমি খেয়েদেয়ে তাঁর দাড়িতে হাত মুছি। মাঝে মাঝে একঘেয়ে লাগলে তাঁর পেটে কাতুকুতু দিই। তিনি নড়েন না, হাসেন না। দিন যায় গুরুদেব ফেরেন না।

ছন্দার কথা তখন মনে পড়ত খুব। শেষে একদিন আমি চূড়ান্ত বিরক্ত হয়ে গুরুদেবের দেহ কাঁধে নিয়ে রওনা হলাম। তারপর অনেক কান্ড করে এদেশ ওদেশ ঘুরতে ঘুরতে— যেটা আমি

ভ্রমণকাহিনী হিসাবে পরে লিখবো, দাম করব বারো টাকা— হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আমি শিয়ালদায় পৌঁছে গেছি, উপরের বাঙ্কে গুরুদেবের দেহ।

মানিক চুপ করল। আমি এতক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে ওর উপাখ্যান শুনছিলাম। শুনতে শুনতে ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। বললাম সেটা কোথায়? ইয়েটা, মানে সেই দেহটা?'

মানিক বিরসমুখে ঘরের কোণে গিয়ে শীর্ষাসন করল। বলল, খাটের নীচে, ঐ যে।'

আমি বিছানা ছেড়ে তিনফুট লাফিয়ে উঠলাম।

মানিক চিন্তাক্লিষ্ট মুখে বলল, অমিতাভ, আমি এখন কি করি? গুরুজীর আত্মা সেইখানে নিশ্চয় এতদিন ফিরে এসেছে। আমাকে আর শরীরকে না পেয়ে তিনি ঠিক হন্নে হয়ে আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন। যে কোন মুহূর্তে আমার আশঙ্কা হচ্ছে মস্তক শতধা বিদীর্ণ হবে।'

এই সময়ে একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ হল, আর কে যেন বলে উঠল, না হবে না।'

আমি চারিদিকে তাকালাম। ঘর ফাঁকা কেউ নেই।

আবার সেই অপার্থিব স্বর, সেই ব্যাটা কেবলানন্দ হরিদ্বারে বিয়ে করে ঘর সংসার পেতেছে। ওর পৈতে উঠোনে টাঙিয়ে ওর বৌ কাপড় শুকোতে দেয়।'

আমি ভীতস্বরে বললাম, 'এ কি?— একে?'

এবার বিদেহী মনে হল ফ্যানেরা উপর থেকে বলছে, 'আমি বোম্বাই থেকে আসছি। হরিদ্বারে নিজের দেহ ফেরৎ চাইতে গেলাম কিন্তু লোকটা ভাগিয়ে দিল। বললে কিনা, আমি যেন ওর শিষ্যের কাছ থেকে ওর দেহটা চেয়ে নিয়ে তার মধ্যে বাস করি। দেখুন দিকি, কি কান্ড! এখন সারাজীবন আমাকে তার বিচ্ছিরি মোটা শরীরটায় কাটাতে হবে। কি অন্যায়, কি নিষ্ঠুর বঞ্চনা!' বলতে বলতে মনে হল সে হতাশ হয়ে টেবিলে বসল।

পুরো ঘটনাটায় আমার যদিও একটু একটু ভয় করছিল তবুও কোনমতে সেই সব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'বোম্বাই কেমন দেখলেন? ইয়ে মানে মমতাজ?'

হঠাৎ টেবিল থেকে ফুলদানি লাফিয়ে উঠে সশব্দে মাটিতে আছড়ে পড়ল। আমি আঁতকে বললাম, কি হল?'

যখন কেবলমাত্র, সে বলল, মুখের ভাষায় কুলোয় না আমি শব্দ ব্যবহার করি।'

'ও', আমি বললাম, ইয়ে, মানে জিনৎ আমন?'

ঝনঝন করে দেয়াল আলমারির কাঁচ ভেঙে পড়ল।

আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম, 'আচ্ছা, তাহলে ইয়ে, মানে— '

মানিক হাত পা ছুঁড়ে চেঁচাল, আর না, আর না।'

অশরীরী বলল, 'বড্ড কষ্ট হতো মাঝে মাঝে। শেষে দেহ নিতে এসে এই চিত্তির। ভাল্লাগে না মাইরি। যাই, ওটার মধ্যেই যাই, এবার তার স্বর খাটের নীচে গেল, বিদায়! এঃ, লোকটা রেগুলার স্নান করতো না দেখছি, কি করে যে নিজের সঙ্গে থাকতো। বুঝতে পারছি না।

এই সময় দুম করে দরজা ঠেলে ছন্দা এসে ঢুকলো ঊর্ধ্বশ্বাসে। সে একই গতিতে তুমি এসেছো। আমায় জানাওনি কেন গো?' বলতে বলতে মানিকের দিকে এগোচ্ছিলো, কিন্তু সেই সময় খাটের তলা থেকে জটাজুটধারী বিশাল একজন সাধু বেরিয়ে আসতে থমকে গেল।

মানিক— যেন কিছুই হয়নি এইভাবে— বললে, 'ও কিছু না ছন্দা। অমিতাভর বন্ধু।'

সাধু একপায়ে দাঁড়িয়ে মাথার পিছনে চুলকোতে লাগল। আমি মানিকের বিশ্বাসঘাতকতায় বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম, আরো দুঃখিত হলাম যখন মানিকের কথাগুলো ছন্দা কেমন বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিল।

সাধুর সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে যেতে আহতদৃষ্টিতে পিছনে তাকালাম। দেখলাম ছন্দা দ্রুতবেগে মানিকের দিকে এগিয়ে গেল বোধ হয় আলিঙ্গন করার জন্যে কিন্তু মানিক গোমুখাসন করছিল বলে সুবিধা করতে পারল না।

* * *

কান্না-হাসি

বরুণকুমার সরকার

খেঁদোবাবু কেবল হাসেন, তাই দেখে তাঁর স্ত্রী বললে—সবসময় হাসবে না, কখনো কখনো কাঁদতেও তো পারো! স্ত্রীর হুমকিতে ভদ্রলোক কেবল কাঁদেন, দু'একদিন কান্না শুনে প্রতিবেশীগণ ভাবে— "কেউ হয়তো মারা গেছে" কিন্তু দিনের পর দিন কান্নাকাটি বেড়ে যাওয়াতে সবার চোখ কপালে, পুনর্বার স্ত্রী রেগে গিয়ে বললে— কখনো কাঁদবে! কখনো হাসবে!! যা কথা তাই কাজ! বেশ কিছু দিন পর একরাত্রে বাড়ীতে ছিঁচকে চোর ঢুকলো, তাই দেখে ভদ্রলোক কান্না জুড়ে দিলেন, চুরি করে চোর পালানোর সঙ্গে সঙ্গে খেঁদোবাবু হাসতে হাসতে স্ত্রীকে খবরটা দিলেন।

সিনেমা—টিকিট

খুব দেরী হয়ে যাওয়াতে এক ভদ্রলোক দৌড়ে সিনেমা হলে গিয়েই টিকিট Counter -এ হাত ঢুকিয়ে বললেন—দাদা একটা ওপরের টিকিট দিন। ভিতর থেকে খুব শোকস্বরে উত্তর এলো—শশ্মান ঘাটে যান।

বাড়ীর পথ

খেঁদোবাবু একদিন জোর করে তাঁর বন্ধুকে বললেন—তোমার বাড়ীতে বেড়াতে যাবো কিন্তু পথঘাট যে চিনি না। বন্ধুটি মাথা চুলকে বললেন— এই সোজা গিয়ে ডান দিকে যাবেন, সেখানে একটা মন্দির আছে, সেই মন্দিরের পাশ দিয়ে দুটো পথ আছে, প্রথম পথটি ছেড়ে দ্বিতীয় পথটি ধরে..... আর একটু যাবেন..... সেখানে দশটি দোকান আছে..... তার দুপাশে দুটি ঘর.....

কিছুই বুঝতে না পেরে খেঁদোবাবু রাগের মাথায় বললেন—এই পথের শেষ কোথায়? বন্ধুটি অবিলম্বে উত্তর দিলেন—যেখানে আপনি হাঁপিয়ে যাবেন।

শেষ ইচ্ছা

একদিন একটি ইঁদুর কাঁদতে কাঁদতে বেড়ালের কাছে গিয়ে বললে—বেড়াল মামু! বেড়াল মামু! আপনি আমাকে খেয়ে নিন। বেড়াল অত্যন্ত খুসী হয়ে বললে—আচ্ছা। তোকে নয় খেয়েই নেবো, কিন্তু তোর শেষ ইচ্ছেটা কী? ইঁদুর উৎসুকে জবার দেয়—আমার আগে যেন আপনার মৃত্যু ঘটে।

ঠান্ডা জল

দুই বন্ধু হোটেলে গেলো, ওদু ও বদু, ওদু বললে—যে কোনো একটি আইটেমের অর্ডার দে, যা খাওয়াবি তাই খাব। কদু রাজী হয়ে গেল এবং দশ গেলাস ঠান্ডা জলের অর্ডার দিলো।

হাসি

এক ভদ্রলোক কথায় কথায় হাসে আর হাসে। বন্ধুরা একদিন ঠিক করলো তাঁকে কাঁদাবেই কাঁদাবে। বেশ কয়েকদিন পর কিছু বন্ধুরা খুব শোক স্বরে তাঁকে বললো— তোর বউ মারা গেছে। সে কথা শুনে ভদ্রলোক হাসতে হাসতে পথে গড়াগড়ি খেলেন বার দশেক! বন্ধুরা অবাক হয়ে বললে— আরে মশাই আপনি কেমন লোক, আপনার বউ মারা গেছে শুনেও হাসছেন! ভদ্রলোক হাসতে হাসতে জবাব দিলেন— অন্ততঃ ঝগড়ার হাত থেকে বাঁচলাম!

হাসিটুন

নীহারুল ইসলাম

উপসাগরীয় যুদ্ধ প্রায় প্রত্যেক মানুষের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল কিছুদিন আগে। পরিচিত অপরিচিত-র কোন ভেদ ছিল না, শুধু মুখোমুখি হলেই আলোচনা।

এপাড়ায় কাকা আর অন্য পাড়ার ভাইপো-র বাজারে তরকারী কিনতে গিয়ে দেখা।

ভাইপো কাকাকে প্রশ্ন করল, কাকু গতরাত্রে আপনাদের পাড়ায় স্কাড পড়েনি তো?

কাকা বললেন, হ্যাঁ বাবা একটা পড়েছে

—ক্ষয়ক্ষতি হয় নি?

—না বাবা তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে এককাদি কলা নষ্ট হয়েছে, সেটা কলার ঝোঁড়ে পড়েছিল কিনা।

—যাক বাবা বাঁচা গেল। আমি ভেবেছিলাম বড়সড় ক্ষতি হল বোধহয়।

—তুমি সে খবর জানলে কি করে?

—জানলাম মানে, ওটা তো আমাদের পাড়ায় পড়েছিল। ভাগ্যিস আগে থাকতে দেখতে পেয়ে হাত দিয়ে ঠেলে দিলুম, ওমনি সেটা আপনাদের পাড়ার দিকে ঘুরে গেল।

—ওঃ তাই বল। ওটার গায়ে ফিংগারপ্রিন্ট দেখে আমি তো খুব সমস্যায় ছিলাম কে জানে যে ওটা তোমার ফিংগার প্রিন্ট। তা বাবা এ ভুলটা করতে গেলে কেন? একটা 'প্যাট্রিয়ট' দিয়ে ঠেলে দিলেই তো পারতে!

ম্যাকবেথ হত্যারহস্য

— জেমস থারবার

"কী বোকার মতোই না ভুল"। বললেন মার্কিন ভদ্রমহিলাটি। ওঁর সঙ্গে আলাপ ইংলন্ডের লেক অঞ্চলের এক হোটেলে। "কাউন্টারে ছিল। পেঙ্গুইন সিরিজের অন্য সব বইয়ের মতো। ঐ যে, ছ পেনি পেপার-ব্যাক বইগুলো। ভেবেছি ওটাও কোনো গোয়েন্দা গল্পের বই হবে। অন্যগুলো গোয়েন্দা বই কি না। বাকিগুলো পড়া ছিল। ভাল করে না দেখেই ওটা কিনে নিয়েছি। পড়তে গিয়ে দেখি 'শেক্সপিয়র'। ভাব একবার, কীরকম খেপে গেছলুম।" চুকচুক করে আমি সহানুভূতি জানাই। সঙ্গিনী বলেই চলেন, "পেঙ্গুনওলাদের কান্ডকারখানা আমার মাথায় ঢোকে না। সেক্সপিয়রের নাটক আর গোয়েন্দা বই চেহারায় টেহারায় হুবহু এক! কোনো মানে হয়"! আমি বললুম, "মলাটের রংটা তো আলাদা।" উনি জানালেন, "তো হবে। অত খেয়াল করিনি। বিছানায় আয়েস করে শুয়েছি। একটা দারণ রহস্য গল্প পড়ব বলে। আর হাতে কী না, 'ট্রাজেডি অব ম্যাকবেথ'! একটা ইশকুল পাঠ্য বই। যেমন, 'আইভ্যান হো'। আমি বললুম, "বা লর্ন ডুন"। মার্কিন মহিলাটি বললেন, "যা বলেছ! আমি বাপু ভাল আগাথা ক্রিস্টি বা ঐ ধরণের কিছুর ভক্ত। আমার প্রিয় ডিটেকটিভ হলেন এরকুল পোয়ারো।" আমি জানতে চাইলুম, "যিনি খুব ছটফটে?" আমার অপরাধ গল্প বিশেষজ্ঞ বললেন, "ও! না! উনি তো বেলজিয়ান। তুমি বলছ পিংকারটনের কথা। যিনি ইনসপেক্টর বুলের সহকারী। হ্যাঁ, তিনিও বেশ।"

দ্বিতীয় কাপ চায়ে চুমুক দিতে দিতে আমার মার্কিন সঙ্গিনী একটা রহস্য গল্পের ঘটনার বিবরণ দিতে শুরু করলেন। বইটা তাঁকে পুরোপুরি বুদ্ধু বানিয়েছিল। আগাগোড়া ভেবেছেন, ওটা পারিবারিক চিকিৎসকের কাজ। তাঁকে থামিয়ে জানতে চাইলাম, "ম্যাকবেথ পড়লেন?" "পড়তেই হল। পড়বার মতো একটা চোখা কাগজও ঘরে ছিল না।" জিজ্ঞেস করলাম, " ভাল লাগল?" উনি পরিষ্কার জানালেন, "মোটেই না। প্রথমত, আমি মুহূর্তের জন্যেও ভাবিনি যে এটা ম্যাকবেথের কীর্তি।" ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে রইলুম। মুখ নিয়ে বেরোল, "কীসের কীর্তি?" মহিলা বোঝালেন, "এক মুহূর্তের জন্যেও ভাবিনি যে ও-ই রাজাকে খুন করেছে। কখনো ভাবিনি, শ্রীমতী ম্যাকবেথও এতে জড়িত। তুমি ওদের যতই সন্দেহ কর, ওরা কোনাভাবেই দোষী নয়। হতে পারে না।" আমি বলতে যাই, "আপনি বোধ হয় ভুল করছেন—।" আমাকে থামিয়েই বলতে থাকেন মহিলা, "গোড়াতেই কার কাজ বুঝে গেলে তো পুরোটাই মাটি। সেক্সপিয়র অত বোকা নন। আমি পড়েছি, 'হ্যামলেট'-এ নাকি কেউ কিছু ধরতেই পারেনি। 'ম্যাকবেথ' যত সহজ মনে হচ্ছে, শেক্সপিয়র আদপেই অত সহজ করেন নি।" পাইপ ভরতে ভরতে ভাবতে থাকি। হঠাৎ জিজ্ঞেস করি, "কাকে সন্দেহ করেন" চটলদি জবাব মহিলার, "ম্যাকডাফ"। ক্ষীণকণ্ঠে শুধু বলতে পারি, "হায় ভগবান!" অপরাধ বিশেষজ্ঞা বলে চললেন, "হ্যাঁ। ম্যাকডাফই করেছে। কোনো ভুল নেই। এরকুফ পোয়ারো এক নিমেষে ধরে ফেলতেন," জানতে চাই, "বুঝলেন কী করে?" মহিলার উত্তর, "গোড়ায় পারিনি । সন্দেহ করেছিলুম ব্যাঙ্কোকে। আর তারপর, কি বলব, সেই তো খুন হল পরের বার। এই

অংশটা দিব্যি লিখেছেন। প্রথম খুনের সন্দেহভাজনকে দ্বিতীয় বারে খুন হতেই হবে।" বিড় বিড় করি আমি, "তাই নাকি।" সংবাদদাত্রী জানালেন, 'নিশ্চয়। তোমার চমকের মধ্যে রাখতে হবে না।" দ্বিতীয় খুনের পর আমি অব্দি ধরতে পারি নি কে আসল অপরাধী!" "দুই রাজপুত্র ম্যালকম আর ডন ব্রেডের সম্বন্ধে কী ভেবেছেন? যদ্দুর মনে পড়ে, প্রথম খুনের পর পরই তারা পালিয়েছিল। এটা সন্দেহজনক। নয় কী!" মার্কিন মহিলাটি জবার দেন, "অতীব সন্দেহজনক। একটু বেশী সন্দেহজনক। শোনো। যারা পালায় তারা কদাচ দোষী হয় না। কথাটা মনে রেখ।" আমি বলি, " আরেকটু ব্রাণ্ডি চাই।" ওয়েটারকে ডাকলুম। সঙ্গিনী আমার দিকে ঝুঁকে পড়লেন। উত্তেজনায় উজ্জ্বল চোখ। হাতের চায়ের কাপ কাঁপছে। জানতে চান, "বল তো, ডানকানের লাশ কে খুঁজে পেয়েছিল?" আমি বলি, " দুঃখিত। সবগুলিয়ে গেছে।" উনি জানালেন, "ম্যাকডাফ। ম্যাকডাফ খুঁজে পেয়েছিল।" পিছলে নামলেন ঐতিহাসিক বর্তমানে। "চেঁচাতে চেঁচাতে নামছে সিঁড়ি ভেঙে। ' ঈশ্বরের পবিত্র মন্দিরে শুরু হয়েছে বিশৃঙ্খল' ও 'নারকী হত্যাটি সুচারুভাবে সংঘটিত' এই রকম এটা সেটা।" হাঁটুতে খোঁচা মেরে বলেন, " কিছু বুঝলে? সব গড়াপেটা। আচ্ছা! সামনে হঠাৎ কোনো মৃতদেহ পড়ে থাকতে যদি দেখি, ঐ রকম বকবকম মুখ দিয়ে বেরোবে তোমার? বেরোয় কখনো?" আমার চোখের ওপর তাঁর মর্মভেদী দৃষ্টি। আমতা আমতা করি, "আমি। মানে—" "ঠিক বলেছ। করবে না। করতে, যদি আগেভাগে ঠিক করে রাখতে। যে কোনো নিরীহ, নিষ্পাপ লোক বলবে, 'সর্বনাশ! একটা মড়া!'

এতক্ষণে হেলান দিয়ে বসতে পারলেন। মুখে পরিতৃপ্তি! বোঝার ও বোঝানোর।

কিছুক্ষণ ভেবে জিজ্ঞেস করলুম, "তৃতীয় খুনী সম্বন্ধে কী ধারণা আপনার? জানেন তো তিন নম্বর খুনী তিনশ বছর

ধরে ম্যাকবেথ বিশারদদের ধাঁধায় রেখেছে?" "কারণ তারা কখনোই ম্যাকডাফকে হিসেবের মধ্যে আনেনি। তাই। আমি নিশ্চিত। এ-কাজ ম্যাকডাফের না হয়ে যায় না। আরে বাপু, একজনকে খুন করা কি এলেবেলে ছ্যাচড়ের কম্ম? তাকে কেউকেটা হতেই হবে।" একটু ভেবে আবার জিজ্ঞেস করি, "কিন্তু ব্যাঙ্কোয়েট দৃশ্যের বেলা? ব্যাঙ্কোর ভূত এল। বসল নিজের চেয়ারে। ম্যাকবেথ অপরাধীর মতো আচরণ করছিল। এর ব্যাখ্যা কী? মহিলা সামনে ঝুঁকে পড়েন। হাঁটুতে টোকা মেরে বলেন, "ধুস। ওটা কোনো ভূতই নয়! ওর মতো ঐ রকম লম্বাচওড়া, ডাকবুকো লোক আনাচে কানাচে ভূত দেখবে কী! তাও আবার আলো ঝলমল ব্যাঙ্কোয়েট হলে! চারদিকে সেখানে লোক গিজগিজ করছে। ধুর। ম্যাকবেথ কাউকে আড়াল করতে চাইছিল।" আমি বলি, "কাকে আবার আড়াল করবে?" উনি বললেন, "কেন? শ্রীমতী ম্যাকবেথকে! ম্যাকবেথ ভেবেছিল, খুনটা করেছে স্ত্রী। তাই ব্যাপারটা নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। স্ত্রীরা যদি সন্দেহভাজন হয়, স্বামীরা এমনই করবে তবে।" আবার জিজ্ঞেস করি, "বেশ। এবার ঘুমের মধ্যে হাঁটার দৃশ্যটাকে ব্যাখ্যা করবেন কীভাবে?" মার্কিন ভদ্রমহিলাটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, "একই ব্যাপার। খালি উল্টো দিক দিয়ে। এখন গিন্নি কর্তাকে আড়াল করতে চাইছেন। উনি আদপেই ঘুমোন নি। মনে আছে জায়গাটা? 'শ্রীমতী ম্যাকবেথের বাতিদান হস্তে প্রবেশ?" হ্যাঁ বলে আমি সায় দিই "তবেই বোঝো। যারা ঘুমের ঘোরে হাঁটে, তারা কখনো আলো বয়ে বেড়ায়? ওদের থাকে একটা দ্বিতীয় দৃষ্টি। কদাচ শুনেছ, ঘুমন্ত লোক আলো নিয়ে হাঁটছে?" "না। কখনো শুনি নি।" "বেশ। তাহলে গিন্নি ঘুমোছিলেন না। জেগেছিলেন। স্বামীকে বাঁচাবার জন্যে অপরাধীর অভিনয় করছিলেন।" আমি বলি, "আমার আরেকটু ব্রান্ডি চাই।" ওয়েটারকে ডাকি। আনা মাত্র ঢকঢক করে খেয়ে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াই। বলি। "আপনার এলেম আছে। ঐ 'ম্যাকবেথ'টা একটু ধার দেবেন। আজ রাতে একটু নেড়ে চেড়ে দেখব। কেমন যেন মনে হচ্ছে, বইটা আদপেই পড়িনি।" উনি বললেন, "দিচ্ছি। মিলিয়ে দেখ, ঠিক বলেছি কী না।"

সে রাতে নাটকটা খুঁটিয়ে পড়লুম। পরের দিন ভোরে জলখাবার খেয়ে মার্কিন ললনার খোঁজ করলুম। পেলুম বোলিং মাঠে। নিঃশব্দে তাঁর পেছনে এসে হাত ধরলুম। চমকে উঠলেন তিনি।

মৃদুস্বরে বললুম, "কিছুক্ষণের জন্যে একলা পাব আপনাকে?" সাবধানে সম্মতি জানালেন ঘাড় নেড়ে। পিছু পিছু এলেন এক নির্জন জায়গায়। রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু পেয়েছ মনে হচ্ছে?" বিজয়ীর গলার বলে উঠি, "বের করেছি আততায়ীর নাম।" তিনি বললেন, "বলতে চাও ম্যাকডাফ নয়!" বললুম, "ম্যাকডাফ নির্দোষ। যেমন নির্দোষ ম্যাকবেথ বা তার স্ত্রী।" নাটকের বইটা হাতেই ছিল। দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য বের করলুম। বললুম, "দেখুন ম্যাকবেথগিন্নি বলছেন, 'আমি ওদের ছুরি তৈরি রেখেছি। ওগুলো নিতে নিশ্চয়ই সে ভুলবে না। ঘুমোলে ওকে আমার বাবার মতো লাগে। নাহলে ঠিক ওটা করতুম।' দেখছেন?" বোকার মতো মাথা নাড়লেন মার্কিন মহিলাটি, "নাতো!" চেঁচিয়ে উঠি, "কেন? এতো জলবৎ তরলম। অবাক হয়ে যাচ্ছি কেন আদ্দিন চোখ এড়িয়ে রইল। ঘুমোলে ডানকানকে অবিকল লেডি ম্যাকবেথের বাপের মতো দেখায়। দেখাবেই তো। তিনিই যে তাঁর পিতা।" মহিলাটি মৃদস্বরে বলে ওঠেন, "হায় ঈশ্বর! ম্যাকবেথের স্ত্রীর বাবাই শেষে খুন করল রাজাকে।" সায় দিই, "হ্যাঁ। এবং কারো পায়ের শব্দ পেয়ে লাশকে খাটের নিচে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। নিজেও হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়েছিল।" মহিলা বলেন, "একবার মাত্র গল্পে এসেছে এমন লোক খুনী হতে পারে? তা হয় না।" "তা জানি বলে দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য খুললুম। "এই যে এখানে বলেছে, 'একজন বৃদ্ধ সমেত বসের প্রবেশ।' এখন, এই বৃদ্ধকে আর দেখা যায় নি। আমি বলতে চাই, ইনিই ম্যাকবেথের স্ত্রীর পিতা। মেয়েকে রাণী করাই যার ধ্যানজ্ঞান। খুনের উদ্দেশ্য পাওয়া গেল।" তাঁর আর মনে ধরে না, "তবু সে তো সামান্য চরিত্রমাত্র।" আমি উজ্জ্বল হাসি, "না। সামান্য থাকবে না। যখন বুঝবেন তিনিই অদ্ভুতুড়ে বোনের একজনের ছদ্মবেশে আছেন।" "বলছ, ঐ তিন ডাইনির একজন?" "ঠিই তাই। বৃদ্ধের বক্তৃতাটা মনে করুন। 'গত মঙ্গলবার গর্বোদ্ধত বাজ পাখিকে পেড়ে ফেলল ইঁদুরখেকো পেঁচা।' কী রকম শোনাচ্ছে?" নিরুসোহে সঙ্গিনী বললেন, " মনে হচ্ছে যেন ঐ তিন ডাইনি কথা বলছে।" আমি আবার বলি, "ঠিক তাই।" "হয়তো তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু—"। আমি বলি, "কিন্তু নয়। আমি বিলকুল ঠিক বলছি। এখন কী করব জানেন?" মহিলা জানান, "না কী?" বলি, "একটা 'হ্যামলেট' কিনব। ঐটার সমাধান করব।" চোখ চকচক করে উঠল মহিলার। জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যামলেট ওটা করেনি? কাকে সন্দেহ কর?

রহস্যময়ভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে জবাব দিলুম, "প্রত্যেককে।" তারপর ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে যেমন নীরবে এসেছিলুম, তেমনি অদৃশ্য হয়ে গেলুম।

ম্যাকবেথ মার্ডার মিস্ট্রি : জেমস থারবার।

ভাষান্তর : মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়।

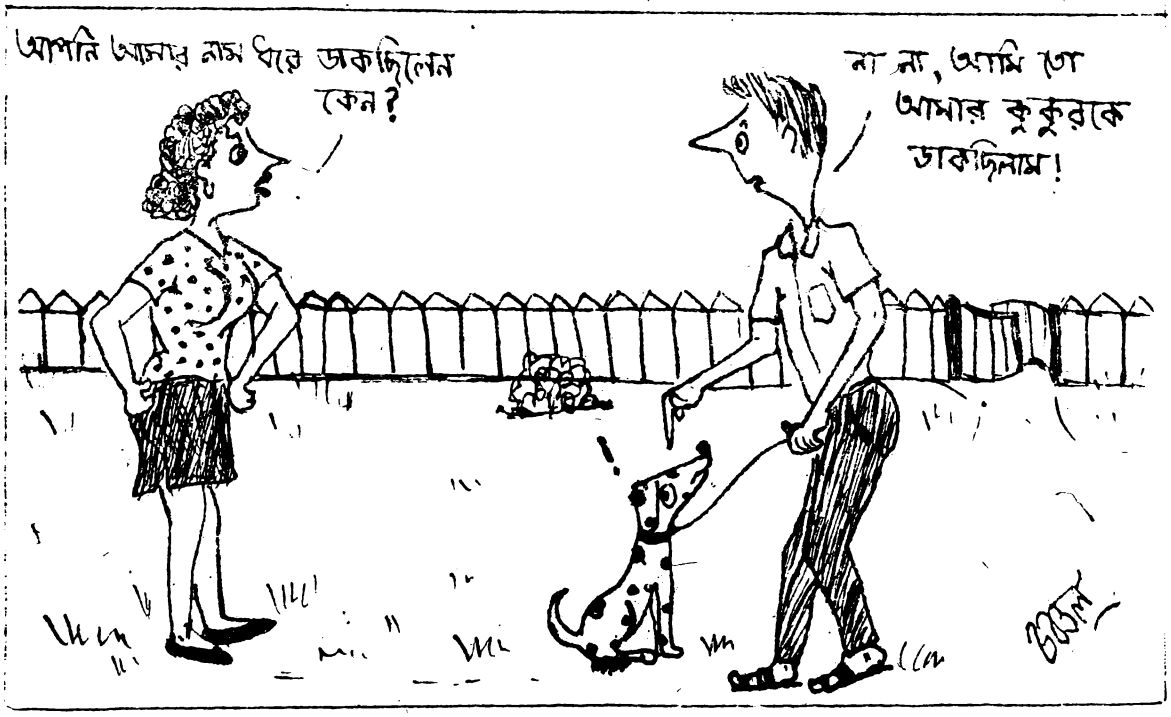

নব-পদাবলী

শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে হিংসা সত্য
তাহার উপরে নাই ।
হিংসায় যদি হাত রাঙা করে
সকলেই বলে জল্লাদ
তাহলেই হবে বিপ্লব, আহা
তাহলেই হবে আহ্লাদ ।
মারতে মারতে মরতে মরতে
থাকবে না কেউ বর্তে
মর্ত্যের লোক স্বর্গ পেলেই
স্বর্গ নামবে মর্ত্যে ।

হচ্ছে হবের দেশে

সব পেয়েছির দেশে নয়
হচ্ছে হবের দেশে
কাঁঠাল গাছে আম ধরেছে
খাবে সবাই শেষে ।
দুধের বাছা, কাঁদো কেন
হচ্ছে হবের দেশে
গোরুর বাঁটে মদ নেমেছে
খাবে সবাই হেসে ।
হাত পা কেউ নাড়বে নাকো
হচ্ছে হবের দেশে
ফাইল জমে পাহাড় হলে
প্ল্যানগুলো যায় ফেঁসে ।
কারখানাতে ঝুলছে তালা
হচ্ছে হবের দেশে
মিছিল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে
বক্তৃতা দেয় ঠেসে ।
মনের কথা লুকিয়ে রাখে
হচ্ছে হবের দেশে
সবাইভাবে পেয়ে যাবে
সব কিছু অক্লেশে !
লক্ষ্মী সোনা, ভয় পেয়ো না
হচ্ছে হবের দেশে
হাজারটা দল বাজায় মাদল
বিপ্লবীর বেশে ।

(১৯৭৩)

জিজ্ঞাসা

ডান হাতে আর বাম হাতে মিলে
বেঁধে গেল বাক্ যুদ্ধ
ডাইনী সে জোরে মটকিয়ে দিল
বামার কবজি সুদ্ধ ।
শিরে করাঘাত হানে বাম হাত
সমুখে আইন পুস্তক
বলে, 'তুমি তারে শাস্তি না দিলে
কী করতে আছো, মস্তক ?'
মস্তক থাকে তটস্থ হয়ে—
ডান হাতে দিলে শাস্তি
সেও যদি বলে, 'আছো কী করতে ?
এর চেয়ে ভাল নাস্তি ।'
আমরা সভয়ে দেখছি দাঁড়িয়ে
জননীর দুরবস্থা
এমনিতে ছিল অঙ্গহীনা সে
হবে কি ছিন্ন-মস্তা ?

(১৯৬০)

ফলার

কী খেয়েছে ? কী খেয়েছ ?
বল আমায় সত্য ।
আর তো কিছুই যায় না পাওয়া
তাই খেয়েছি আজব খাওয়া
মা ঠাকুমার রেখে যাওয়া
কাঁঠালের আমসত্ত্ব ।
খেলে কিসে ? খেলে কিসে ?
বল আমায় খাঁটি ।
বাসন যত ছিল ঘরে
বিকিয়ে গেছে ওজন দরে
বন্ধ ছিল সাত পুরুষের
সোনার পাথরবাটি ।

(১৯৬৫)

বাতাসিয়া লুপ

ছ'টা কুড়ি
ট্রেন ছেড়েছে শিলিগুড়ি ।
ডিং ডং
ছাড়িয়ে গেল কার্সিয়াং ।
ঝুম ঝুম
এবার বুঝি এলো ঘুম ।
টিং টিং
ঘুম থেকে যায় দার্জিলিং ।
ইয়া ইয়া
এই কি সেই বাতাসিয়া ?
চুপ চুপ
সামনে বাতাসিয়া লুপ ।
নমো নমো
বিশ্ব মাঝে উচ্চতম !
বেঁকে বেঁকে
ট্রেন চলেছে বৃত্ত এঁকে ।
ঘুরে ঘুরে
ট্রেন চলেছে ঘূর্ণি জুড়ে ।
ওগো কাকী
ট্রেন কি ঘুমে ফিরল নাকি !
মজা খুব
ট্রেন যে হঠাৎ দিল ডুব ।
লাইন তলে
নামতে থাকা লাইন চলে ।
ও পারেতে
ট্রেন কে দেখি দৌড়ে যেতে ।
টিং টিং
ঐ যে আসে দার্জিলিং ।।

(১৯৫৭)

কমলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছড়া

ছড়্‌রা

সাম্যবাদ

সাম্যবাদের ভাবনাগুলো
অলীক কেন কহ যে?
দেখিয়ে দেব, বাজার চলো—
আঙুল-চোখে সহজে।
পুঁটির মূল্য ইলিশ তুল্য
বাজার দরে বর্তমান,
শ্রেণীদ্বন্দ্ব পুরো ভুললো
কাঁচকলা ও মর্তমান!

বি. বা. দি. বাগ

আনতে পারেন (উপায় শুনুন)
সব বিবাদ-ই বাগে;
জমায়েত আর মিছিল করুন—
সব বি.বা.দি. বাগে!

সংসার (১)

বিয়ে মানে রকমারি
ঝঞ্ঝাট— ঝকমারি,
অসহ্য জ্বালা এই
সংসার চালানো;
প্রতিদিন একটানা,
বউ গায় গানখানা,
পুরাতনী গান সেই—
ডাল আনো, চাল আনো!

সংসার (২)

রাত্রি জেগে অ্যাডাল্ট ছবি—
টি ভি খুলে দেখেন বিবি,
ঘুম ভাঙ্গে তাঁর দেরি ক'রে
একটু বেশি বেলাতে:
ছেলেদেরকে স্কুলে ছেড়ে,
দুধের ডিপো—বাজার সেরে,
পাচক সাজি রান্না ঘরে—
অফিস যাওয়ার ঠ্যালাতে!

সংসার (৩)

যুদ্ধ না থিয়েটার?
মানে বলো কি এটার?
(মারপিট বউ-বরে।
পরিণতি বিয়েটার!)

পাকা কথা

খোলাখুলি ব'লে নেবে
ইচ্ছা যা মাইন্ডে;
পাত্রকে কি কি দেবে—
ক্যাশে আর কাইন্ডে।
নেওয়া ভালো কথা ব'লে
বিবাহের পূর্বেই;
নববধূ তা না হ'লে
কেরোসিনে পুড়বেই!

অভাব

C.L. নিয়ে, লাইন দিয়ে,
কর্তা এলেন ঘুরে;
জানান তিনি, গ্যাস পাননি—
অভাব রাজ্য জুড়ে।
ঠিক তখনই, হাঁকছে শুনি;
ঘরের দোরে— 'গ্যাস.....
পাবেন দিদি, ছাড়েন যদি,
একস্ট্রা কিছু ক্যাশ।'

বন্ধু

কাল ক'রেছো সাপোর্ট যাকে—
ছিলো প্রাণের দোসর;
আজ শত্রু বল'ছো তাকে,
খুঁজছো ত্রুটি-দোষ ওর!

লেখাপড়া

ক্লাস ওয়ানে ছেলে পড়ে;
পরীক্ষা বার্ষিক;
ছানা-বড়া চোখ, ঘরে
দেখে পারিপার্শ্বিক।
দাদু লেখে, বাবা পড়ে,
মা কষেন আঁক;
নাওয়া-খাওয়া নেই ঘরে—
প্রাণ হাঁকপাঁক!

অর্থনীতি

কিনতে জিনিস (মূল্যে ভীতি)
দু'চোখ বেরোয় ঠিক্‌রে;
মন্ত্রী বলেন ঃ 'অর্থনীতি,
হাঁটছে পথে ঠিক্‌রে'!

পলাতক আসামী

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

লোকটা দাঁত খিঁচিয়ে বলল আমাকে,— ভালো চাও তো কেটে পড়ো এখান থেকে।

আমি লোকটার মাথার এলোমেলো চুল ও গালের খোঁচা খোঁচা দাড়ির দিকে তাকিয়ে তার ভ্রূ-কুঞ্চিত রুষ্ট নজরকে তাচ্ছিল্য করে বললাম,— এটা একটা সরকারী পার্ক, কারুর বাপের সম্পত্তি নয়। এই বেঞ্চটায় একাধিক মানুষের বসবার মত যথেষ্ট জায়গা রয়েছে। সুতরাং এখানে আমি বসবো।

লোকটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রুক্ষ মেজাজে বলল সে,— আরো বেঞ্চ আছে, সেখানে যাও। এই বেঞ্চে আমি এখন শোব।

ওর কথা শুনে মৃদু হেসে বললাম,— শোবার ইচ্ছে থাকলে বাড়ি যাও। পার্কে কেন?

মাথা গোঁজ করে জবার দিল লোকটা,— না, আমি বাড়ি যাবো না। আমার বাড়িঘর নেই, সকাল থেকে এই পার্কেই পড়ে আছি। আমার কেউ নেই।

আমি বললাম,— বেশ, তাহলে থাকো এই বেঞ্চে পড়ে। মশার কামড় খাও। রাত্রে হয় পুলিশে ধরবে, আর নয় তো—

লোকটা পুলিশের কথায় একটু ঘাবড়ে গেল মনে হ'ল। ওর মুখ চোখের রুদ্ধ ভাবটা মিলিয়ে যেতে লাগল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল,— আর নয় তো কী?

— বেঞ্চ থেকে গড়িয়ে নীচে পড়ে মাথা ফাটবে। রক্তারক্তি হবে। কথাটা বলে আমি মুখ টিপে হেসে এগিয়ে গেলাম। লোকটা পিছন থেকে আমার জামা টেনে ধরল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে বললাম আমি,— মেজাজ দেখিয়ে তো তাড়িয়ে দিচ্ছেলে, এখন আবার জামা ধরে টানছো কেন? যাও না, শুয়ে পড়ো বেঞ্চে।

— শোব, একটু পরেই শোব। ততক্ষণ না হয় আমার পাশে একটু বোসো তুমি। বড্ড একা একা লাগছে।

লোকটা কিছুতেই আমার জামা ছাড়ছিল না। অগত্যা গিয়ে বসলাম ওর পাশে।

— একা থাকতে যদি ভয় লাগে তাহলে পার্কের বেঞ্চে রাত কাটাতে এলে কেন? রাস্তার ফুটপাতে তো অনেকেই রাত্রে শুয়ে থাকে। তুমিও তো তাদের সঙ্গে—

— না না, ফুটপাতে শুতে আমি রাজি নই। বড্ড নোংরা। লোকটা বলল, — তার চেয়ে পার্কের বেঞ্চ অনেক ভালো, অথবা কোনো বাড়ির বারান্দা।

লোকটার দিকে সহানুভূতির নজরে তাকালাম। ওর জামা কাপড় দেখে ওকে বাউণ্ডুলে বলে মনে হ'ল না। চোখের দৃষ্টিতে পাগলামির কোনো লক্ষণ নেই। মুখের ভাব দেখে লোকটাকে বড়ই বিষণ্ণ বলে মনে হ'ল। ও নিশ্চয়ই বাড়িতে ঝগড়া করে বেরিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে পার্কে। এ'রকম তো হামেশাই হয়।

আমি আন্দাজে একটা ঢিল ছুঁড়ে বললাম,— তা বেশ তো, নিজের বাড়িতেই ফিরে যাও না। তোমার বউ হয়তো পথ চেয়ে আছে।

লোকটা চট করে গরম হয়ে উঠল আমার কথা শুনে। সে' বলল। — কার বউ পথ চেয়ে আছে? আমার? তুমি আমার বউকে চেনো না। ও কারো পথ চেয়ে থাকে না।

উঠে দাঁড়ালাম আমি। রুষ্ট হয়ে বললাম. — তুমি একটা মিথ্যুক। বাজে লোক। তোমার সঙ্গে আর কথা বলতে চাই না। যা ইচ্ছে করো, আমি চললাম।

— আহা, চটছো কেন? আমি তোমাকে মিথ্যে কথা বললাম কখন? বসো না আরেকটু। লোকটা অনুনয় করে বলল।

— কক্ষণো না। এই মাত্র তুমি আমাকে একটা ডাহা মিথ্যে কথা বললে। তুমি বাড়িঘরই নেই তার বউ আসবে কোত্থেকে? আর, বউ যদি থাকে তা'হলে বাড়িঘর নেই এ'কথাটা সত্যি নয়।

— শোনো ভাই। লোকটা আমার হাত ধরে বলল.— আমার বউ নেই, এ'কথা আমি বলি নি। বাড়ির দলিলটা বউয়ের নামে, অতএব আমার নিজের বাড়িঘর নেই, এ'কথাটা মিথ্যে নয়। বউ যদি আমাকে তার বাড়ি থেকে বের করে দেয়, এবং মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়, তা হলে, তুমিই বলো, আমি কী করতে পারি?

— হুঁম্। তার মানে তোমার বউ তোমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।কেন?

— কি করে বলবো? আমার বউয়ের স্বভাবটাই বরাবর ওই রকম। কারণে অকারণে ক্ষেপে যায়। গালাগালি দেয়, মারধোর করে।

— তোমাকে মারধোর করে তোমার বউ?

— না, মানে ঠিক আমার গায়ে ও এখনো হাত তোলেনি, তবে ছেলেমেয়েদের সারাক্ষণ খুব বকাবকি করে, ধরে পেটায়। লোকটা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলল, — আমি মনস্থ করেছি যে সংসার ত্যাগ করবো। বিবাগী হবো। এই পার্কে—

— থামো, থামো, এই পার্কটা বন নয়। একটু আগে তোমার কেউ ছিল না। এখন দেখা যাচ্ছে তোমার বউ আছে, ছেলেমেয়েও আছে। কটা?

লোকটা একটু থতমত খেয়ে বলল,— বউ, না ছেলেমেয়ে?

— দুটোই।

বিষণ্ণ বদনে বলল লোকটা, — এ'টি তৃতীয় পক্ষ। আমাকে সুখ ও শান্তি দেবার জন্য দেহরক্ষা করেছিল প্রথম দু'জন, পাঁচটি ছেলেমেয়ে রেখে। ওই একই উদ্দেশ্যে আমার তৃতীয় পক্ষকে ঘরে এনেছিলাম। তার সন্তানের সংখ্যা তিন।

আমার চোখ কপালে উঠে গেল। বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম আমি লোকটার মুখের দিকে। বিস্ময় ক্রমশঃ ক্রোধে রূপান্তরিত হতে লাগল। লোকটার জামার কলার মুঠো করে ধরে আমি চড়া গলায় বললাম,—

তুমি একটা ক্রিমিনাল! চলো তোমাকে পুলিশে দেব।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে লোকটা আমার দিকে করুণ নজরে তাকিয়ে প্রশ্ন করল. — আমাকে পুলিশে দেবে? কেন, আমি কী করেছি?

— বধূহত্যা! আমি রূঢ়ভাবে বললাম,— দুটি বউকে মেরেছ. আরেকটিকে তিলে তিলে মারছো। তোমার মত ঘৃণ্য কালপ্রিটরা সরকারী প্রচেষ্টাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে দেশের জনসংখ্যা বাড়িয়ে তুলছে, বেকার ও

সমাজ-বিরোধীদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। তোমার মত জেল পলাতক আসামীদের জন্য রেল ষ্টেশনে বা পার্কে একটা বেঞ্চেও বসবার জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না আজকাল।

লোকটা এবার হাতজোড় করল, বলল কাতর কণ্ঠে,— দয়া করে আমাকে পুলিশে দিও না। আমি তোমার পায়ে পড়ছি। আমি জেল পলাতক আসামী নই। আমি অহিংস, বউয়ের নির্যাতন সইতে না পেরে সংসার ত্যাগ করে আমরণ অনশন করছি পার্কের এই বেঞ্চে। সারাদিন জলস্পর্শ করি নি। এখানে শুয়েই আমি দেহত্যাগ করবো। তোমাকে কথা দিচ্ছি, জনসংখ্যা আর বাড়াবো না। একটা অন্ততঃ কমিয়ে যাবো।

লোকটার কলার ছেড়ে দিলাম। গম্ভীরভাবে বললাম, — এসো আমার সঙ্গে।

— কোথায়? ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল লোকটা।

— যে জেলখানা থেকে পালিয়েছে সেখানে তোমায় ফিরিয়ে দেব। উঠে এসো, নয়তো পুলিশ ডাকতে বাধ্য হবো।

লোকটা সুড়সুড় করে উঠে এল বেঞ্চ থেকে। আমি ওর একেটা হাত শক্ত করে ধরে বললাম, — তোমার বাড়ির ঠিকানা বলো। উলটোপালটা বললে কিন্তু রেহাই পাবে না, সোজা তোমাকে থানায় নিয়ে ঢুকিয়ে দেব।

পার্ক থেকে বেশি দূরে বাড়ি নয় লোকটার। গলিতে ঢুকতেই— বাবা এসেছে, বাবা এসছে! বলতে বলতে উল্লসিত হয়ে চারটি ছেলেমেয়ে ছুটে এল। চারজনেরই পোষাক জীর্ণ, এবং চেহারায় দারিদ্র্যের স্পষ্ট ছাপ। ওরাই লোকটার হাত ধরে, হই হই করে টানতে টানতে নিয়ে গেল একটা ছোট্ট বাড়িতে। সমবেত কণ্ঠে হাঁক দিল,— মা, মা, কে এসেছে দ্যাখো?

একটি তরুণী বধূ বেরিয়ে এসে লোকটাকে দেখেই ঘাড় কাত করে থমথমে মুখে থমকে দাঁড়াল।

আমি কাছে এগিয়ে গেলাম। বললাম— পলাতক আসামীকে ধরে নিয়ে এসেছি। একে কি আপনি ঘরে ফিরিয়ে নেবেন, না পুলিশের হাতে তুলে দেব?

বধূটি কটমট করে তাকাল লোকটার দিকে।

কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল লোকটা,— বাসনা, চায়ে একটু বেশি চিনি ছাড়া তোমার কাছে আমি কোনোদিন কিছু চাই নি। চাইব না, তা-ও চাইব না। দোহাই তোমার, আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিও না। আমি তাহলে মার খেতে খেতে মরে যাবো।

লোকটার করুণ অবস্থা দেখে হাসি পেয়ে গেল আমার। বধূটিও সম্ভবতঃ হাসি চাপতেই তার মুখখানা ঘুরিয়ে নিল। এক মেয়েকে সম্বোধন করে বলল সে,— সুষমা, তোর বাবাকে বল এর পর পালাবার চেষ্টা করলে ঠ্যাং দু'টো ভেঙে রাখবো। ওঁকে ভেতরে আসতে বল্।

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, "আপনি চায়ে বেশী চিনি খান না কম?"

আমি হাসতে হাসতে বললাম, ওনার মত বেশী চিনি চেয়ে আমি ওনার মত পালাতক আসামী হতে চাই না। আমি তার আগেই কেটে পড়ছি। বলেই আমি ফিরে চললাম— পার্কে।

ছেলে মেয়েরা ঠেলতে ঠেলতে লোকটাকে বাড়ীর ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

—

—আরে খুড়ো! কুকুরটা হারালে একটা এ্যাড্-ভার্টাইজ করলে না?

—কি হবে! কুকুরটা যে পড়তে পারে না··· !

রবীন ॥

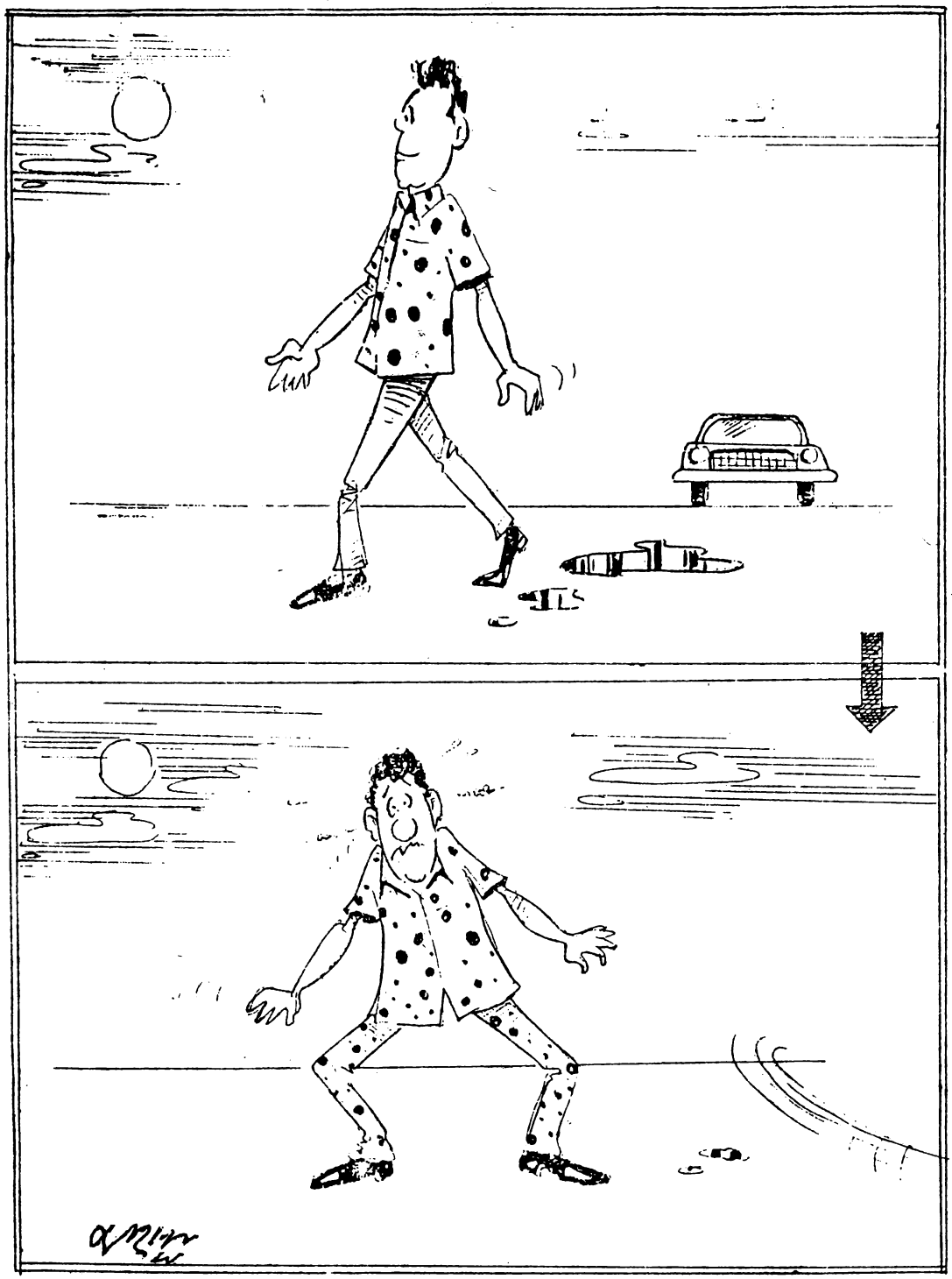

শ্রীরসময় সরকার

পত্রাঘাত

('পত্রাঘাত' বিভাগে উত্তর পাবার জন্য সরস চিঠি লিখুন। বুদ্ধিদীপ্ত মজার চিঠি লিখলে সরস উত্তর পাবার সুযোগ থাকে। ব্যক্তিগত বিষয়ে বা লেখা বা আঁকা মনোনীত হলো কিনা তা 'পত্রাঘাত' বিভাগে ছাপা হবে না।
প্রতিমাসে 'পত্রাঘাত' বিভাগের শ্রেষ্ঠ পত্র লেখককে সেই সংখ্যা বিনামূল্যে পাঠানো হবে।)

অপর্ণা মুখোপাধ্যায় ঃ ইন্দপুর, বাঁকুড়া—৭২২ ১৩৬

'সরস কার্টুন' আমাদের বাড়ীতে নিয়মিত আসে। তাই পত্রিকাটি পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়। 'সরস কার্টুন'এর পাতায় নিয়মিত 'সরস বোঁদে' পরিবেশন করার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

● আপনাদের সবার যা জিভ দেখছি তাতে ভয়ের কথা! কেউ চাইছেন বোঁদে, কেউ রসমালাই, কেউবা জিভে গজা। এদিকে কারিগররা সাপ্লাই দিয়ে উঠতে পারছে না। ফলে 'সরস কার্টুন'-এর ময়রা সম্পাদক দারুণ বিপাকে পড়েছেন। এবার তিনি ভোলা ময়রার মত মিষ্টি পরিবেশনের বদলে কবি-গান গাইতে শুরু করলে তাকে দোষ দিতে পারবেন না কিন্তু!

অলোক দাশগুপ্ত ঃ ৬৬, বিহাইভ গার্ডেন্স, কলকাতা-৭০০ ০৫৬

প্রচ্ছদের ছবি অথবা প্রথম পাতার বড় কার্টুন কি আমরা পাঠাতে পারি না? কারণ পত্রিকার দেওয়া নিয়মানুসারে (চওড়া ৩") ও ধরনের কার্টুন পাঠানোর ক্ষেত্রে একটা সমস্যা থেকে যাচ্ছে। ...একটা কথা বলি ...দেখবেন আবার ফুলে যাবেন না, Satyamurthy-র How to draw cartoon থেকে আপনার বইটা অনেক ভালো।

● আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর, নিশ্চয়ই পাঠাতে পারেন। আসলে সমতা বজায় রাখবার জন্যে নিয়ম করতেই হয়েছে। তা সত্ত্বেও কেউ স্কেচ পেনে, কেউ বল পেনে, কেউ বা কালো ফাউন্টেন পেনের কালিতে ইচ্ছে মতন কোনও মাপের তোয়াক্কা না রেখে কার্টুন এঁকে পাঠাচ্ছেন। ফলে বিষয় বা আঁকা ভাল হলেও তাদের কার্টুন ছাপা যাচ্ছে না। অফসেট প্রসেসিং করতে হলে চাইনিজ ইঙ্কেই আঁকতে হবে এবং আঁকার নিয়ম মানতেই হবে। যা খুশী তাই করলে প্রসেসিং করা যাবে না।

আমার "আসুন কার্টুন আঁকি" বই সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার উত্তরে বলি, গ্যাস খেয়ে ফুলতে ফুলতে অনেক আগেই ফেটে চুপসে গেছি। তাই এখন চেষ্টা করলেও আর ফোলানো যাবে না। তবু ধন্যবাদ।

অমিত সরকার ঃ খালুই বিল মাঠ, বর্ধমান—৭১৩ ১০১

আরে ও সম্পাদকদাদা,
করছেন কি কেসটা?
হাসির রসেতে কি
ডোবাতে চান দেশটা?
বিরস বঙ্গের মুখে
সরস কার্টুন ঠুকে
হাসাতে হাসাতে পেট
ফাটাবেন কি শেষটা?

● রাম গরুড়ের ছানা
হাসতে যাদের মানা
হাসির রসে পিছলে পড়ে,
ভাঙ্গছে তাদের ডানা।
'সরস কার্টুন' দেখলে তবু,
বলছে শুধু 'না', 'না'।।
এবার বলুন তবে
হাসির রসের মিষ্টি সুরায়
সবাই কি আর ডোবে?

দেবেন্দ্র নাথ দাস ঃ ৫০ বারিডি মার্কেট, বারিডি, জামশেদপুর—১৭

আপনার প্রকাশিত 'সরস কার্টুন' পত্রিকাটি আমদানী করলাম। অবশ্য পয়সা দিয়ে কিনে নয়। আমার বন্ধু আমাকে পড়তে দেবার জন্য রপ্তানী করেছে। পড়ে সত্যি খুব ভাল লাগল। আহা যেমন তার রচনা তেমনি তার কার্টুন! সত্যি বলতে কি আমি একেবারেই মুগ্ধ!

● আহা, এমন বন্ধু যদি সবার একটি করে থাকতো! তাহলে 'সরস কার্টুন'-এর বিক্রি চড় চড় করে বাড়তো। ভাগ্যিস আপনি পয়সা দিয়ে কেনেন নি, তাই এর স্বাদে আপনি মুগ্ধ। কড় কড়ে পাঁচটি টাকা ট্যাক থেকে খসে গেলে নিশ্চয়ই হতেন ক্রুদ্ধ! আপনার বন্ধুকে ধন্যবাদ।

অমল কুমার সাণ্ডিল্য ঃ ৩/১২৩ ফার্টিলাইজার কলোনী, দুর্গাপুর—১২

পত্র পত্রিকা কিনতে গিয়ে বইয়ের দোকানে বিচিত্র বর্ণের বাহারী বই দেখে

বর্নকানা হয়ে যাই। কিন্তু পাঁচমাথার মোড়ে বইয়ের দোকানে ডিসেম্বরের শেষে জানুয়ারীর পাঁচরঙা ঝক ঝকে 'সরস কার্টুন'টা ঝট করে চোখে পড়ে গেল। হাস্যকর দাম পঞ্চ তঙ্কা। এতে শঙ্কা নেই। ঠন্ ঠন্ করে পাঁচটা চাঁদি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সোজা বাড়ী।

খুলেই এক গোঁত্তা। রেখায় রেখায় পাগলামি— প্রেমে পাগল— খাদ্যে পাগল— সদ্য পাগল। সে না হয় বুঝলাম। এসব পাগলদের যে কদাচিৎ দেখা মেলে না তা নয়। তবে সঙ্গীতে সংহিতা ফ্যান্টাসি। পয়সা উশুল। কার্টুন এখানে অনেকটাই উৎরে গেছে। এখনকার মানুষের মনে আবেগের গ্যাস নেই, একক সঙ্গীত কেউ গায় না। রাগপ্রধান তথৈবচ। তবে দ্বৈত সঙ্গীত আকছার শোনা যায়। বাজার থেকে ফিরেই রোজ গিন্নির সাথে দ্বৈত সঙ্গীতের মহড়া দিতে হয়।

● একেই বলে 'বদ্ধ পাগল'। যা ঃ ওটা আঁকাই হয় নি!

পদাঘাতই শুধু পেলাম

সুনীল নস্কর

চাকরী হল মাছধরা। আলাদিনের বরাত আর রবার্টব্রুসের ধৈর্য্য নিয়ে ছিপ ফেলে বসে থাকো। যখন যা উঠবে। রুই - কাতলা উঠলেও উঠতে পারে। আবার কঁ্যাকড়ায় টোপ ঠুকরে বেরিয়েও যেতে পারে। - তবু বসে থাকতেই হয়। যে খেলার যা নিয়ম। চাকরী কি সহজে মেলে; সহসা উদয় হয় শুভযোগ পেলে।

থেকে থেকে একটু - আধটু ফ্রাসটেশানের হেঁচকি উঠবে। এই রে, সাজানো বাগান বুঝি শুকিয়ে গেল। এ জীবন বিফলে গেল রে, নেপু। ন দেবায়; ন হবিষায়। রামপ্রসাদ সেনের উপদেশটা নিলে কাজে লাগতো! আবাদ - মাবাদ শিখলেও যা হোক সোনা - রূপো ফলত। জীবন মধ্যাহ্নেই, এ যে দেখি, জীবনের ভুঁতি বেরিয়ে আসতে চায়।

আচ্ছা, আমার মত যদি কোন দেশনায়কের বরপুত্রটিও এই রকম ধন্ধে পড়তেন! কি হত? তিনি কি আমার মতই মানষিক শূন্যতায় উপলব্ধি করতেন - নাঃ, এভাবে বাঁচা যায় না। এমন করে চলতে পারে না। একটা কিছু করা দরকার। হয় এসপার; না হয় ওসপার।

ধ্যুৎ, তাই কি হয়!

তেনারা হলেন মহামানবের সন্তান। ঈশ্বরের 'রিবন-টায়েড' বেবী। তাঁরা কখনো এ দুগগতির শিকার হন! তেনারা সর্বংসহা।

যদি এমন হত।

সেই মহামানবের বংশতিলক, আমার মতই শতাব্দীলালিত একটি বেকার বিদ্যালঙ্কার। পেটে বিদ্যের ক্যাপসুল। মুখে বদহজমের চোয়া ঢেকুর। গল্পের শশকের মত ধারালো বুদ্ধি। গিলে করা শরীর। তাগড়া পালোয়ানী স্বাস্থ্য। শক্ত, সমর্থ। সম্ভাবনার সুপ্ত ভিসুভিয়াস। অথচ মনের আকাশে লাট খাচ্ছে গোটাকতক দুঃশ্চিন্তার বাদুড় প্রথম চিন্তা, চাকরী। কেরিয়ারে ড্যাং ড্যাং করে ওঠার একটা সিঁড়ি চাই। জীবনের ক্যাশসার্টিফিকেট। যা হাতে নিয়ে খ্যাপলা হাসি হাসতে হাসতে বলা যায় - আরে ইয়ার, জীবন হল 'নস্যি নস্যি'।

কিন্তু যদি এমন হয়।

সরস্বতীর সিলেবাসের গোলে পড়ে দেশনায়ক তনয়ের বয়সের অর্দ্ধেক ধেড়িয়ে গেছে। চোয়াল চড়িয়ে মুখাবয়ব ত্যাবড়া সিঙাড়ার খোল। যদি সরকারী চাকরীর আর বয়স না থাকে, (না থাকারই কথা। তিনটে জিনিষ মানুষের ভীষণ বাড়ে - দেনা, চিনি আর বয়স)! তখন কি হবে! অর্জুনের ন্যায় জীবনযুদ্ধের রথে দেশমুখনন্দন ধেসকে পড়বেন বিষাদযোগে। চাকরীর কুরুক্ষেত্রে ইন্টারভিউনেনেওয়ালা লর্ডকৃষ্ণেরা যে বিশ্বরূপ দেখান আজকাল, বেকার পার্থের তো অ্যানিমিয়া ধরে যাবার খাপ! জীবনের বাঁধন শিথিল হয়ে আসছে দেখে তিনিও কি মনে মনে এই ভাবে আঁৎকে উঠবেন - কোথায় আছি রে ভাই! অধীচি নরক নয় তো!

ধুর, তাই কি হয়! তাঁদের ভবিষ্যৎ কেরানি চিত্রগুপ্তের হাতে লিখিত নয়। স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর 'তৃতীয় হস্তে' লেখেন। যদি এমন হত!

দেশমুখনন্দন আমার মতই জীবিকার সন্ধানে উদ্‌ভ্রান্ত -পাগলপারা। জীবনের বায়োডাটা বইতে বইতে পরিশ্রান্ত। দিনের পর দিন অ্যাপ্লিকেশন হস্তে রাজপথ দুরমুস করেই চলেছে সার্কাসের একটা ভাল্লুক। শ্রীপদে শোভিত ইয়া বড় বড় গুপো। শহর পরিক্রমার স্মৃতিচিহ্ন চক্ররেলের কায়দায় অফিসপাড়ায় চরকিপাক খেতে খেতে কি ভাববেন তিনি?

হায়রে, চাকরির সিংহদুয়ারে বন্ধ্যা কপাল ঠুকে ঠুকে গোল আলু ফলিয়ে দিলুম কপালে। ক্ষেতে ফলালে দেশের আলু সমস্যার খানিকটা সমাধান হত। পোড়া সরকারের হাতশক্ত করা যেত। দুর্ভাগ্য আলু এখন ধর্মের ষাঁড়েদের কপালেই ফলছে। কুচুটে বিজ্ঞানের কেরামতি হবে হয় তো! কুরুক্ষেত্রের ভড়ভড়ে পাঁকে যেন শাপগ্রস্ত মহাবীরকর্ণের জীবনরথের চাকাটা পুঁতে যেতে চাইছে। উঠি উঠি করেও যদি সে চাকা আর না ওঠে! বীতশ্রদ্ধ দেশনায়ক পুত্রের তখন কিরকম অনুভূতি হবে?

ধ্যুস, তাই কি হয়! তেনারা অন্য কোটির মানুষ। বাপের গদি টলে গেলেও মরা হাতি লাখ টাকা।

যদি এমন হত।

আমার ভদকা অভিভাবকটি কোন দেশনায়কের মতই একজন ইনফ্লুয়েনশিয়াল ব্যক্তি। দোদর্ণ্ড প্রতাপ। চুনোপুটি নয়, বেশ রাঘববোয়াল। ক্যাপিট্যালিজম্ কিংবা সুবিধাবাদিজমের ছুঁচো গেলা রোডরোলারের মত বেশ ভারী এম.পি কি পুরমন্ত্রী-ফন্ত্রী। বড়বড় দপ্তর তাঁর কটুকাটব্যে তটস্থ। মালিক কাফুরের মত চড়কো মেজাজ। স্বভাবে ব্লটিং পেপার সদৃশ। যে কোন ভিটেতে জোড়া ঘুঘু চরাতে পারেন। আবার তাঁরই বদন্যতায় যে কোন সংসার হতে পারে জমাট কুলপী বরফ। কথায় কথায় 'আমি বলছি' বলেই বাজিমাৎ করে দেবেন। কল্পনাপ্রসূত সেই অভিভাবক মার্চেন্ট অফিসের বড়কর্তাকে আমার জন্য এইভাবে একটু ডায়াল করবেন ঃ

'অমুককে পাঠাচ্ছি। আমার দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যম ভ্রাতা। তোমার অফিসে একটা হিল্লে করে দিও হে।'

বড়কর্তা ভিমরি খেয়ে 'আপনি কে স্যার' বলে বকনা বাছুরের মত চাঁট ছুঁড়তে থাকবেন। কোঁত পেড়ে বলবেন হয়তো - 'পাঁচটা পোস্টে পাঁচহাজার অ্যাপ্লিকেশন পড়েছে স্যার। তার মধ্যে তিনটি রিজার্ভ - দুটি পৌরকর্তার, একটি ইউনিয়নের বরাদ্দ। তাহলে থাকল মোটে .....'

তিনি অমনি ক্ষমতার লালবাড়ি দেখিয়ে খানিকটা ধমকধামক দেবেন জানো আমি কে? আমি হিসেব শুনতে চাইছি না। হিসেবটা ইনকাম ট্যাক্সেই দিও। কর্তা আর ঘাঁটাতে সাহস পেলেন না। ওরেঃ বাবা। প্রভাবশালী কোন মন্ত্রী কি পুরকমিশনার টনার। প্রশাসনকে কান ধরে ওঠবস করাতে পারেন। কোনদিন শিং মেরে এক্সপোর্ট - ইম্পোর্টের দুনম্বরী ব্যবসার গনেশটাই দেবে উল্টে। তিনবার হয়তো সিঁটি মারলেই 'পেটো পাঁচু' 'ক্ষউরগোপালরা' এসে ধাপ ধোলাই দিয়ে ছেড়ে দেবে। কি ধড়মুণ্ড আলাদা করে অ্যানাটমীর জ্ঞান পরীক্ষা করবে।

সুতরাং 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' করে তিনি গদগদ কণ্ঠে বলবেন ঃ 'আজই পাঠিয়ে দিন, স্যার। একজন সমাজসেবীর শ্যালক বেকার - এতো জাতির লজ্জা। অফিসে এবার থেকে 'ক্লিন নো ভ্যাকান্সি' ঝুলিয়ে দেব স্যার'।

হাজার টাকার সুরে পাঁচ হাজার বেকার স্বপ্নের দেউল তুলছিল। হড়মুড় করে তাসের ঘরের মতই পড়ে গেল অদৃশ্য হাতের কেরামতিতে। ওরে দেখ দেখ, বাঙালীর লেঙ্গীর জোর কি রকম দেখ একবার। আমার অভিবাভক যদি দেশনায়কের কায়দায় আমাকেই এইভাবে জীবিকার ঘোড়ার লাগামটা হাতে ধরিয়ে দিতেন তখন কি সেই দেশনায়কনন্দনের ভেতর থেকে হতাশার একটা সানাই থেকে থেকে বেজে উঠত বেহাগের সুরে - রাজনীতির এই গেন্তুয়া খেলা আর কতদিন চলবে, প্রভু। আমার দেশনায়ক - অভিভাবক চি সমস্যার চিতা রচনা করে 'হ্যা - হ্যা' করে বিজয়ীর হাসি হাসবেন। আর বলবেন - হরে কৃষ্ণ হরে। তোদের

পায়ে না থাক মাটি। আমি গদির পরে। একেই তো বলে সুবিধাবাদিজম্। সুযোগ পেলেই ঝাড়ো। জ্যায় শ্রীরাম। তখন সেই ফেকলু দেখমুখতনয়ের কেমন লাগত!

ধ্যুস্, তাই কি হয়। তাঁরা মুখে সোনার চামচ ঠুসে পৃথিবীতে ল্যাণ্ড করেন। যদি এমন হত!

কোন দেশনেতা তাঁর সংসারের শুঁতোয় প্রহরে প্রহরে 'ক্যাহুয়া' ক্যা হুয়া' রব তোলেন। আমার অভিভাবকের মত, তিনি হয়তো ক্যাবলা - ক্যাবলা, হ্যাবলা - হ্যাবলা একটা ন'টাকার মেনিমুখো কেরাণী। উপর ওলার পদপল্লবে তৈলমর্দনের কায়দা জানেন না। চাকরীটাও বেশ দাপটের নয়। তিনমাস 'অফিসের দরজায় সুস্বাগতম্, তো বাকি ন'মাস তালা সাঁটা। মাসের শেষে তাই রস শুকিয়ে আসে। যা মাইনে পান, তিনদিনেই খেল খতম। মুদী ঘাড় ধরে শ'দুয়েক গেঁড়িয়ে নেয়। স্নেহঝরা গোদুগ্ধ মাসকাবারী শতখানেকের সুড়সুড়ি দেয় ট্যাঁকে। এডুকেশন বাবদ যে মিটার ওঠে, সেও ইলেকট্রিক বিলের সঙ্গে কম্পিটিশন করার ক্ষমতা ধরে। বড় বড় সব ধাক্কা। তারপর ডাক্তার - বদ্যি মস্তকে স্নেহের হাত বুলিয়ে দেন। সব দিয়ে থুয়ে, শেষমাসে হাতে ধরে থাকেন হ্যারিকেন। নিজের জন্য বরাদ্দ ফাঁসা লুঙ্গি আর ভেন্টিলেটার বসানো গেঞ্জি - সারা জীবনের রাজবেশ। আর রাজভোগ? কাঁকরমণি চালের ভাত আর পুঁইশাকের ফ্যাস্তাফ্যাচাং তরকারী। পাওনাদাররা সুযোগ পেলেই খাবলে খুবলে দেয়। মাথার উপর খাড়ার মত ঝুলে আছে দু 'দুটো পাতাল ভৈরবীমার্কা, দাঁত উঁচু ধেড়ে ধেড়ে অনূঢ়া কন্যা। জীবনের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে বিবর্ণ ,হতশ্রী। ভিটে মাটি চাঁটা হবার উপক্রম। যেন কেতরে পড়েছেন ওয়াটার্লুর সেই পরাজিত নেপোলিয়ান। জীবনযুদ্ধে নিজে হেরেছেন, জোর করে টেনে এনেছেন আরও কয়েকজনকে পরাজিতের মিছিলে। তার ওপর যোগ্য সন্তানটি যদি জীবিকার ঘোড়ার সওয়ার না হতে পারে। রেওয়াজী খাসীর মত কুম্ভক করে বসে থাকে। বাপের হোটেলে অন্ন ধ্বংস করতে থাকে। - কি ভাববেন তিনি। 'তৃনাদপি সুনীচেন'; তরুরোপি সহিষ্ণুনা এই বৈষ্ণবাদর্শ নিয়ে মানুষ বেঁচে আছে কি করে?

ধৈর্য্যের মগডাল থেকে ভূতলে চিৎপাত খেয়ে আমার অভিভাবকের মতই তিনি হঙ্কার ধ্বনি ছাড়বেন ঃ

- তুমি হলে গিয়ে একটি গাধা আর রাম ছাগলের কম্বিনেশন। ইচ্ছে করলে স্বচ্ছন্দে তোমার শ্রীদেহে একটি লেবেল সাঁটা যায় - 'ষাঁড়ের নাদ'। অয়ার্থলেশ। চুঁচড়োর কার্ত্তিক! প্রিতার এই দুঃসময়ে আমরা এক সময়ে কি করেছি জানো!

- আজ্ঞে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছেন।

- না -জবাব। এখানেও লড়ালড়ি। রাজনীতি করে করে মাথাটাই গেছে। যতসব ডিসপোজালের মাল। বিবর্তনের জোরে ওই ন্যাজটি খসেছে। মনুষ্যপদবাচ্য আর হলে না।

- আজ্ঞে, একটা চাকরী পেলেই দেখবেন।.....

দেশনায়ক একবার মনে মনে 'ফুঃ ফুঃ' করে উঠলেন।

- ভারী আঁতেলের মত কথা শিখেছ। জাবনা কাইছো আর রকে বসে বগল বাজাচ্ছো। বক দেখেছ?

- আজ্ঞে -

- কি তখন থেকে গৃহভৃত্যের মত 'আজ্ঞে আজ্ঞে' করছ। বক - বক, শুদ্ধ বাংলায়, বলাকা। দেখেছ?

- হ্যাঁ! জলের ধারে এক ঠ্যাং তুলে বৃক্ষাসনে দাঁড়িয়ে থাকে।

- কেন থাকে জানো।

- আজ্ঞে মাছ শিকারের চেষ্টায়। এ্যাই যাঃ। আবার 'আজ্ঞে' বলে ফেললুম।

- ও স্বভাব মলেও যাবে না। কাম টু দ্য পয়েন্ট - চেষ্টা। খাদ্য সংস্থানের কি অদ্ভুত প্রচেষ্টা দেখেছ। চাকরী কি আমলকী ফল! নাড়া দিলে পড়বে। ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ - তোমার সে চেষ্টা আছে? কি বুঝলে?

- সংস্কৃত ভাল জানি না।

- জানবে কি করে? শিক্ষাটাই তো তোমাদের বোগাস্। যাও, চোখের সামনে থেকে নড়ে যাও।

দেশমুখতনয় কি ভাববেন। আত্মহত্যা। না, তারজন্যে সাহসের প্রয়োজন। তবে কি বাণপ্রস্থ! ধ্যাস্ বানপ্রস্থ কি এই বয়সে আসে? হারিয়ে গেলে কেমন হয়! কিন্তু মানুষ হারিয়ে যায় কেমন করে! লালবাজার মিসিং স্কোয়ার্ডে একবার জিজ্ঞাসা করলে হত না - হ্যাঁ মশাই, কিভাবে হারিয়ে যেতে হয়?

না, তা হয় না। ভাগ্যবিড়ম্বিত দেশমুখতিলক উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটতে হাঁটতে মোড়মাথায় একটা লাল রকে এসে বসবে। কোন প্রতিপত্তিশালী বিত্তবানের রক। তাঁর বিরাট বাড়ি। মস্ত গাড়ী। বড় চাকরী। বাড়িতে নেতারা আসেন। আসেন সাংবাদিক, শিল্পী সাহিত্যিক। নতুন নতুন ফিয়েট দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর হুস করে চলে যায়। ভদ্রলোক কোন অতিথিকে 'সী অফ' করতে এসেছেন নীচে। উদ্দেশ্যহীনভাবে তার দিকে একবার তাকালো। ভদ্রলোক এই দৃষ্টি আনতে বহু বছর সাধনা করেছেন। পাড়ার এমন একটা মাথাওলা মানুষ থাকতে বেকারগুলোর কিচ্ছু হবে না! এ কেমন কথা। দেখাই যাক কি বলেন।

শুনে ভদ্রলোক একটু অমায়িক হাসলেন। বললেন - যাত্রার বিবেক দেখেছ? কি করে! নায়ক আদর্শচ্যুত হচ্ছে দেখে, গ্রীনরুম থেকে ছুটে এল। বুঁই বুঁই করে একতারা বাজাতে বাজাতে নেচেকুদেঁ ধরল এককলি - 'ফিরে আয়, ওরে অবোধ, ওরে পাগল - ঔ পথে বাড়াস নে তুই পা।' সেই বিবেকের ট্যাকটিস তোমাদের পইপই করে সতর্ক করি। জনসভাতেও বলি। কেউ ঘরে আসলেও বলি। বাবাজী, কোয়ালি-ফায়েড ছেলেরাই আজকাল ফ্যা ফ্যা করছে। ও পথে গলতে যেও না। মাথা উচুঁ করে বাঁচতে চেয়ো না। উচুঁ করলেই একটা বস্তু মেলে - ঠোক্কর। নীচু হতে শেখো। ওসব আশা ছেড়ে মাড়োয়ারী হবার চেষ্টা কর। ছোট দিয়ে ব্যবসা শুরু কর। তারপর বড় ইয়া বড়। তার পর আরো বড়। বিনা ক্যাপিট্যালে কত ব্যবসা আছে জানো! হিংচে আর কলমীর নাম শুনেছ! না শুনে থাকলে, জীবনানন্দের কবিতা পড়ে দেখো। দেখবে, নর্দমার ধারে কি ভ্যাদভেদে জলাতে গলা জাগিয়ে আছে। পিত্তপ্রধান বাঙালী বাজারে দেখলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে। শুধু তোল আর ব্যাচো। কিংবা ধর গেঁড়িগুগলির জল। চোখের মহৌষধ। আইডিয়াল আইড্রপস্। রোজ সকালে ভাটিয়ালী গাইতে গাইতে গ্রামের দিকে মজা পুকুরে চলে যাও। ভোঁদড়ের কায়দায় টুপ টুপ তুলে আনো ডুমা ডুমো গেঁড়ি। লরী লরী সাপ্লাই দাও। কি তোমার চাকরী?

শুনতে শুনতে দেশমুখতনয়ের মুখাবয়বে ফুটতে থাকবে ' রাগ - রাগ,বিরক্তি - বিরক্তির ধুসর ছাতা। মুখ ঝালে - ঝোলে - অম্বলে - চাটনিতে একাকার। ব্যাটা, জ্ঞান দেওয়া বুড়ো। জ্ঞানদাসের বংশধর। জ্ঞান দেবার জন্য যেন মুখিয়ে ছিল। মিষ্টি কথার প্রলেপ মেরে মনের ক্ষত মেজে দিতে চায়।

- বৎস, তোমরা যা যা পার একটু বলে রাখি। ললিতা - বিশাখা - অষ্টসখীসনে ওমরখৈয়ম হয়ে ঘাস চিবাতে চিবাতে ভিক্টোরিয়ার সবুজ

ঘাসের মাথায় টাক ফেলতে পারো। ব্যাঁকা শ্যাম হয়ে ল্যাম্পপোষ্টের সামনে দাঁড়িয়ে - সিঁক সিঁক শিষধ্বনি করতে পারো। অল্পে মেজাজ সপ্তমে তুলতে পারো। শাসনে বেগড়াতে পারো। আদরে মাথায় চড়তে পারো। বারোইয়ারের উৎসবে ইঁটভাটার লরি চেপে ডিস্কোদিওয়ানে হয়ে শ্যামটা নাচতে পারো। মোহনবাগানের গ্যালারীর ম্যানহোলে গলতে গলতেও 'গোল' বলে উচ্ছাসের বাঁধ ভাঙতে পারো। মনের সুখে বার্ডসাই ফুঁকে - নাঃ, সে জিনিষ পাবে কোথা - বিড়ি ফুঁকে লাঙসে ফুটো করতে পারো। মান্নাদের সেই ফেমাস গান, মনে আছে ?

'একি অঙ্গে এত রূপ ....'। সত্যি কি রূপ !

তখন কি আমার মতই দেশমুখতনয়ের মধ্যে থেকেও বঞ্চনা আর চির অবহেলার কুকুরটা একবার ক্ষোভে গর্জে উঠবে - 'মার শালাকে' কিন্তু কে মারবে ? কাকে মারবে ? সমাজকে, ভাগ্যনিয়ন্তা সেই দেশনেতাকে, জগৎসংসারকে না ঈশ্বরকে ? স্বার্থের ব্যাকটেরিয়ারা সবই তো তখন সেঁজিয়ে ছেড়েছে। হতাশার সমাধিতে বসে লাখ লাখ বেকারের এক প্রতিনিধি দেশনায়কের সেই বরপুত্র ক্ষীণকণ্ঠে কি গান গাইবে ? - 'এ দেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম।

না, তা হয় না।

হাসাহাসি

আব্দুল রফিক শেখ

একজন বয়স্ক ভদ্রলোক ফলের দোকানে এসেছেন ফল কিনতে—

দোকানদার : কি নেবেন বাবু বলুন !

ভদ্রলোক : তোমার এই কমলালেবুগুলোর জোড়া কি দর ?

দোকানদার : (মৃদু হেসে) আজ্ঞে বাবু পাঁচ টাকা।

ভদ্রলোক : দু'টাকা জোড়া হবে না ?

দোকানদার : কেন হবে না বাবু, সব হয় আমার কাছে।

ভদ্রলোক : তাহলে দাও··· ··· ,· · !

দোকানদার : পয়সাটা আমার কাছে দিন আর ঠোঙা নিয়ে সামনের ডাস্টবিন থেকে ইচ্ছে মতো তুলে নিন।

॥ দুই ॥

পথ চলতি জগাইয়ের সঙ্গে পটলার দেখা—

পটলা : সেদিন তোকে বইমেলায় দেখছিলাম—তা, কি কি কিন্‌লি ?

জগাই : ওই সামান্য কিছু ?

পটলা : সামান্য কেন ?

জগাই : এমনিতেই তো সাত-আট টাকা পিস, তবে হ্যাঁ—স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়, সারা বইমেলা জুড়ে যেন ম ম করছে একটাই গন্ধ··· ··· !

পটলা : আজকাল বইয়ের গন্ধেও চারিদিক ম ম করে দেখছি—

জগাই : বই না ছাই—মাছ ভাজা, স্রেফ মাছ ভাজা !

॥ তিন ॥

মেয়েটি : জানো তো আমার ভীষণ ভয় করে, যদি কেউ তোমার সঙ্গে আমাকে দেখে ফেলে ?

ছেলেটি : তোমার কোন ভয় নেই—আমি তো পাশে আছি !

মেয়েটি : পৃথিবীতে কোথাও এতটুকু শান্তি নেই, একটু যে প্রেম করবো····· !

ছেলেটি : ভয় পেয়োনা লক্ষ্মীটি, খুব শিগ্‌গির আমরা পৃথিবীর বাইরে যাওয়ার ব্যবস্থা করছি।

॥ চার ॥

রাস্তার পাশেই একটা দোতলা বাড়ির বারান্দায় এক সুন্দরী যুবতী দাঁড়িয়ে ছিল। একটা ছোকরা সেদিকে দেখতে দেখতেই রাস্তা হাঁটছিল আর কিছুদূর যেতে না যেতেই আধবুড়ো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে জব্বর ধাক্কা। ছোকরা রেগে গিয়ে বলে, 'কি ব্যাপার, দেখে হাঁটতে পারেন না।'

—দেখেই তো হাঁটছিলাম।

—তাহলে চোখটা কোন দিকে ছিল ?

—কেন, ওই বারান্দায় দিকে !

—অ !

বেগতিক বাতিক

প্রসূন মহারত্ন

বাতিকবাবুর ঘুম ভালো হচ্ছে না। মগরা থেকে হাওড়ায় ডেলী প্যাসেঞ্জারী করে বাড়ী ফিরে তিনি যখন শুতে যান তখন তার মনে হয় তিনি যেন ট্রেনেই চলছেন। আর এরজন্যই নাকি তার ঘুম-টুম একেবারে গুম হয়ে গেছে। সবুজ গাড়ীর ধকল আর তার সহ্য হচ্ছে না। এর একটা হেস্ত-নেস্ত করতেই তিনি আজ অফিস ছুটি নিয়ে কলকাতায় ফ্ল্যাট খুঁজতে বেরিয়ে গেলেন।

এমনিতে বাতিকবাবু খুব একটা যে উঁচু পোস্টে কাজ করেন তা নয়, তবে যা পান তা দিয়ে তাঁর ঘর সংসার ভালোভাবেই চলে গিয়েও বেশ কিছুটা উদ্বৃত্ত থেকে যায়। ঘুম বাঁচাতে তার অর্ধেক ব্যয় করতেও তিনি রাজি। এদিকে কলকাতা শহরের যা অবস্থা তাতে সস্তায় রাস্তায় থাকাও দায়। অনকে খুঁজে পেতে তিনি মোটামুটি সস্তায় একটা দু-কামরা বিশিষ্ট ফ্ল্যাট পেলেন। জায়গাটা মূল শহর থেকে খানিকটা দূরে, তবে তাঁর অফিস, হাওড়া স্টেশন থেকে অফিসের মতোই দূরে। বাস ষ্টপ বাড়ী থেকে দু মিনিটের হাঁটা পথ মানে যেতে রথের দরকার নেই। এমনিতেও বাতিকবাবু বাস স্টপ লাগোয়া বাড়ী চাইছিলেন না, এতে নাকি বাসের ঘড়-ঘড় আওয়াজে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এইরকম একটা ফ্ল্যাটে রাতে ফ্ল্যাট হয়ে ঘুমোনোর আশা তিনি করতেই পারেন।

ফোর্থ স্যাটার-ডের ছুটিতে মগরার বাড়ী থেকে তিনি সংসার নতুন বাড়ীতে ট্র্যান্সফার করলেন। পুরো একটা সংসার ট্র্যান্সফার কম ধকল নয়, তাই তিনি আজ একটু তাড়াতাড়িই রাত্রি ৯-টার মধ্যেই খেয়েদেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

কিন্তু বাতিকবাবু যা ভেবেছিলেন তা নয়। এতক্ষণ বাড়ীর লোকেদের সঙ্গে গল্পে মশগুল ছিলেন বলে ব্যাপারটা টের পাননি, শুতেই সেটা পেলেন। এখানে ঘুমোনো আরো ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সামনের বাড়ীর গারেণবাবুর বড় ছেলে এবার H.S. দেবে, পাশের বাড়ীর খগেনের ছেলের সামনের বার মাধ্যমিক, পিছনের হরেনের মেয়ের সামনে মাস্থলি টেস্ট। এদের উচ্চস্বরে পড়ার মিলিত আওয়াজ বাতিকবাবুর ঘুমের দফারফার পক্ষে যথেষ্ট। তিনি ঘর থেকে সোজা বেরিয়ে এদের প্রত্যেকের বাড়ীতে গেলেন ; বোঝালেন যে শুধু সকালে পড়লেই তো হয় অত রাত জেগে বিদ্যাভ্যাসের কি প্রয়োজন। কিন্তু তারাও ছেড়ে দেবার পাত্র নয়, তারা বোঝাল যে রাতে ছাড়া তাদের আর গতি নেই ; সারাদিন নাকি প্রাভেট টিউটর আর স্কুল-কলেজেই কেটে যায়, দিন কঠিন তো তাই আজকাল প্রতি বিষয়ে, এমনকি প্রতি চ্যাপটারের জন্যও টিউটর রাখতে হয়। আর তাছাড়া রাতে পড়াটা হাল ফ্যাশানের মধ্যে পড়ে।

উপায়ন্তর না দেখে বাতিকবাবু ঘরে ফিরে জানলাগুলো লাগিয়ে দিলেন যাতে আওয়াজ কিছুটা কমে। যেই শুয়েছেন অমনি লোড-শেডিং, ব্যাস গরমে তাঁর প্রাণ যায় যায় অবস্থা, তাই বাধ্য হয়েই ফের জানলা খুলতেই হল। আবার যেই সেই আওয়াজ।

রাতটা একরকম না ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলেন বাতিকবাবু, ভাবলেন কাল রবিবার আছে সকালে আর দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিলেই চলবে।

ভোররাতে পড়ার ধুম থামতেই বাতিক বাবু ফের ঘুমানোর চেষ্টা করলেন। একটু ঘুমাতে না ঘুমাতেই আবার গলার আওয়াজে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল, কি ব্যাপার না গায়েনবাবু ও তার স্ত্রী সকালবেলায় গানের রেওয়াজ শুরু করেছেন। গায়েনবাবু ও তার স্ত্রী—দুজনেরই বেশ বয়েস—তাই ক্লাসিক্যাল গানই তাঁরা গান। বাতিকবাবু গিয়ে জানলেন যে গলা ভাঁজা নাকি তাদের বহুদিনের অভ্যাস, তাই সেই জায়গায় থাকতে হলে এটা বাতিকবাবুকে মেনে নিতে হবে।

সকাল বেলায়ও আর ঘুম হল না. শরীরটা ভীষণ খারাপ লাগছে। মনে মনে ঠিক করলেন যে এখানে আর থাকবেন না, যা সব ঘটল, সবই রেগুলার ঘটবে, মানে রেগুলার ঘুমের বারোটা বাজবে। এর থেকে মগরা অনেক ভালো। তবে অ্যাডভ্যান্স দিয়েছেন যখন, তখন এ মাসটা কোনমতে কাটিয়ে দেবেন আর কাল রাতের ঘুমটা দুপুরে পুষিয়ে নেবেন।

মাংসভাত খেয়ে দুপুরে যেই না বিছানায় বডি ফেলেছেন, অমনি পাশের বাড়ীতে কানফাটানো হিন্দি গান বেজে উঠল ! ব্যাপারটা বুঝতে পাশের বাড়ী গেলেন। গিয়ে দেখলেন যে খগেনবাবুর বেকার বড় ছেলে বাবলা টেপ-রেকর্ডারে গান বাজাচ্ছে, গান শোনার এটাই নাকি তার সময়—সকালে সে বাড়ীর বাজার করে কিছু আয় করার জন্য আর রাতে বন্ধুদের সাথে রকে বসে ঠেক মারে। সব-ই বাতিকবাবু মেনে নিলেন বললেন, 'তা নয় হল, তো অত জোরে বাজানোর কি আছে ?' বাবলা বোঝাল যে টেপটা নাকি স্টিরিও, সেটা জোরে না বাজালে তার এফেক্টটা ঠিক ধরা পড়ে না।

বাতিকবাবু ক্ষুব্ধ হলেও কোনরকম চোটপাট দেখালেন না। তিনি সোজা একটা গাড়ী ভাড়া করে নিয়ে এসে সব জিনিষপত্র তখন-ই গাড়ীতে তুলে দিলেন, আর এক মুহূর্তও তিনি এখানে থাকবেন না। ফের মগরায় ফিরে চললেন।

লঘুপাক:

জন্মবৃত্তান্ত

— সত্যবান মিত্র

কিছু জন্মবৃত্তান্ত বলার আগে একটু পরিকল্পনা করা দরকার অধিক গল্প ফলালে আবার স্থান সংকুলান হবে না। জন্মশাসন আগে।

এক পরিবার পরিকল্পনা প্রচার সভায় দুই শ্রোতায় জোর তর্ক বেধে গেছে ব্যর্থ কন্ট্রোলের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। তাদের ঝগড়াতেরই প্রকাশ পায় একজন তেরটি সন্তানের জনক অপরজন নিঃসন্তান। হঠাৎ তৃতীয় একজন গর্জে উঠলেন "থামুন আপনারা। আপনাদের কারুরই এ বিষয়ে কথা বলার কোন এক্তিয়ার নেই। কেননা আপনাদের একজনের কোন ব্যর্থই নেই আর একজনের কোন কন্ট্রোল নেই।" লালবাহাদুর শাস্ত্রী কিন্তু এ ভুল করেন নি। এক পরিবার পরিকল্পনা শিবিরের উদ্বোধন করতে গিয়ে সবিনয়ে জানিয়েছিলেন "আমি এ বিষয়ে কিই বা বলতে পারি যেখানে আমি নিজেই সাত সন্তানের পিতা।"

সন্তানহীনা চীনা মহিলা গেছেন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে। আমেরিকান ডাক্তার বলেন "আপনার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব। চটপট শুয়ে পড়ুন। মহিলা দ্বিধান্বিতা। ডাক্তার : "কি হোল?" মহিলা : "কিন্তু ডাক্তারবাবু আমি চীনা বাচ্চা চাই যে।"

আমার এক ঠিকাদার প্রতিবেশী, রমেনবাবুর বাড়ীতে গেছি, তার সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা আমার সামনেই বাবার কাছে আবদার জানায় এবার পূজোয় জামা নয় ছোট্ট ভাই চাই। রমেনবাবুর পরিকল্পনা ছিল পরের বছর মেয়েকে এ ধরনের উপহার দেবেন। মেয়েকে চুপ করাতে বললেন "এখন তো আর সময় নেই মা, এত তাড়াতাড়ি ভাই তৈরী করা যায় না।" মেয়ে বলে "কেন বাবা, তুমি যদি আরও বেশী করে লোক লাগাও তাহলেও হবে না?" (আচম্‌কা এক সংশয় মনে এল। অকৃত্রিম মানুষই কমে আসছে। জন্মধারায় নতুন সংযোজন টেসট্ টিউব বেবীগুলো আরও বিস্বাদ হবে না তো? পোলট্রির ডিম যেমন।)

হারুর বড়দা আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। কিন্তু আবার হারু আমাদের বন্ধু। ষোলটি ভাইবোনের মধ্যে হারু কনিষ্ঠতম। শুনেছি, হারুর জন্মের পর তার বড়দা আমার বাবাকে বলেছিলেন "আজ আবার আমার এক দূর সম্পর্কের ভাই হোল।" বাবা বললেন, "দূর সম্পর্কের বলছিস কেন? এতো নিকট সম্পর্ক, আপন ভাই", বড়দা উদাস স্বরে জবাব দেন "নারে নিকট কি করে হবে। ওর আর আমার মাঝখানে বার জন মানুষ আছে।" সুখের বিষয় হারু নিজে এই সৃষ্টিশীলতার ঐতিহ্য পরিকল্পিত উপায়ে পরিহার করেছে। বংশধারার কথা উঠতে আর এক বিদ্বান অধ্যাপক বন্ধুর কথা মনে পড়ল। হেরিডিটিতে প্রবল বিশ্বাসী এই বন্ধু হেরিডিটি বোঝাতে বলে ফেলেছিল "তোমার ঠাকুরদার বাবা যদি নিঃসন্তান হন তবে তোমার ঠাকুরদাও নিঃসন্তান হবেন এবং তোমার বাবারও কোন ছেলেপুলে হবে না।" বংশধারা বনাম পরিবেশ এই প্রাচীন প্রসঙ্গ সে মাঝে মাঝেই তুলে তর্ক বাধাতে চেষ্টা করতো। আমি কিছু বলতে গেলেই ধমক্ খেতাম "তুই মূর্খ থাম্", একদিন বললাম "এত কথা থামা। এক জ্ঞানী এদুটো বোঝাতে গিয়ে এক কথায় কি বলেছেন শোন—'তোমার ছেলে যদি তোমার মত দেখতে হয় তবে তা হেরিডিটি, আর যদি প্রতিবেশীর মত হয়, তবে জানবে তা এনভায়রণমেন্ট অর্থাৎ পরিবেশের প্রভাব'। সেদিন খবর পেলাম বন্ধু হেরিডিটি বলে কিছু নেই প্রচার করে বেড়াচ্ছে। আরও খবর পেলাম তার ছেলেটা মাধ্যমিকেই পাশ করতে পারে নি।

"ইচ্ছা হয়ে ছিলি আমার মনের মাঝারে" জন্ম রহস্যের এ কল্পনা অনুপম। বাস্তব কিন্তু কঠিন। দুবছর পর বিদেশ প্রত্যাগত এক ব্যক্তি দেখে বৌ-এর কোলে এক বাচ্চা ফুটে রয়েছে, "একি, এ কার বাচ্চা" সে রাগত স্বরে জানতে চায়। বৌটি সরল বিস্ময়ে জানায় "কার আবার! আমার্"। উল্টো ঘটনাও আছে। এক চাষী বউ-এর এক সঙ্গে তিনটে ছেলে হয়েছে। আমাদের এই চাষী ভাই-এর ধারনার দৌড় যমজ অবধি। এমনই সহজাত ধারনা নিয়ে সে তিনটে সন্তানের প্রতিই ক্রমান্বয়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকে ও বৌকে জেরা করতে বসে তৃতীয়টার পিতা কে।

সদ্যজাত ভাইকে দেখে তার ছোট্ট দিদির পছন্দ হয়নি। মাকে বলে "এমা! কি বিচ্ছিরি এই জন্যই কি তুমি ওকে ঢেকে রাখতে।" শিশুরা কেন বড়রাও অনেক সময় ধাঁধিয়ে যায় জন্ম রহস্যে? ইনকাম ট্যাক্স দপ্তর থেকে উচ্চপদস্থ মিঃ ব্লেককে জানানো হয় তিনি অবিবাহিত অথচ খরচের ঘরে এক ছেলের জন্য মাসে একশ পাউন্ড খরচ দেখাচ্ছেন। চিঠিতে এর ব্যাখ্যা চাওয়া হয় এবং মন্তব্য করা হয় এটি বোধহয় স্টেনোগ্রাফারের ভূল। মিঃ ব্লেক জবাব দেন স্টেনোর ভূলেই এমন কাণ্ডটা ঘটেছে।

সেন্সাস কর্মীর প্রশ্নের উত্তরে বিধবা মহিলা জানান তাঁর তিনটে সন্তান বয়স আট, পাঁচ ও এক বছর। তিন বছর হল তাঁর স্বামী গত হয়েছে। কর্মীটি বোধহয় ভূল শুনেছে ভেবে ফের জানতে চায়

"আপনার কোলেরটার এক বছর বয়স অথচ....." মহিলা তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন..... "আমি বলেছি আমার 'স্বামী' মারা গেছেন 'আমি' গেছি কি?"

এ বছরই মাধ্যমিকে এক পরীক্ষার্থীর উত্তর ছিল (এটা সত্যি ঘটনা) 'ঘটোৎকচ হিড়িম্বার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন।' এর বিপরীত ভূল আমি মাঝে মাঝে করে ফেলি। আবহমান কাল ধরে বিশেষত জোলো সিনেমাগুলোতে ছেলেপুলে হবে বোঝাতে প্রায় একই ধরনের দৃশ্য দেখতে হয়। কোন পুং চরিত্রও বমি করতে বসলে আতঙ্ক জাগে, কিরে বাবা! এও আবার গর্ভধারণ করে বসে নি তো?

শেষ করি বিল-এর (মাসের প্রথমে জন্মেছিল তাই তার এই নাম বোধহয়) গল্প দিয়ে। বিলের ভাইবোন হবে, মাসখানেক বাকী। এই জন্ম যেন বিলের মনে অবাঞ্ছিত কৌতূহলের জন্ম না দেয় সে ভার নিলেন বিলের দিদিমা। নাতিকে বলেন "শোনো কিছুদিন পরে আমাদের বাড়ীর ওপর দিয়ে এক পরী উড়ে যেতে যেতে সুন্দর এক বাক্স ফেলে যাবে ছাদে। সে বাক্সে সুন্দর এক উপহার থাকবে তোমার জন্য। কি থাকবে বলতো?" বিল যুগপৎ উত্তেজিত এবং উদ্বিগ্ন। বলে, "কি মজা। কিন্তু দিদিমা, এভাবে উপহার দেওয়াটা আমাদের ঠেকাতে হবে। অত ওপর থেকে একটা বড় বাক্স যদি ছাদে পড়ে কত জোরে শব্দ হবে বলতো? আচমকা ভয় পেলে মার বা বাচ্চাটার ক্ষতি হতে পারে।"

সরস দূরদর্শন

—শ্রী দার্শনিক

এবারের বিষয় ঃ

দর্শকের দরবারে

ঢুকতেই নাদু রিনীকে দেখিয়ে বলল, 'খবরের আগে থেকেই খাড়া হয়ে বসে আছে!' ছ'সাত দিন আগে একটা চিঠি পাঠিয়েছে রিনী। প্রস্তাব, অনেকেই এক জিনিষের বদলে অন্য জিনিষ চায়; টিভিতে এ নিয়ে একটা সাপ্তাহিক বিজ্ঞপ্তি হোক।

যথাসময়ে সেতার বাজিয়ে সুরু হ'ল দর্শকের দরবারে।

দর্শকদের শরীর মন ভাল না থাকলে তাঁরা দরবার দেখবেন না, তাঁর উত্তরের মুন্সিয়ানার প্রশংসাও করবেন না— এ কথা বিলক্ষণ বোঝেন বলেই সরোজ রাহা সুরুতেই তাদের শুভকামনা জানান। আজও বললেন, 'আশা করি সকলেই ভাল আছেন!' তারপর জানালেন, এ সপ্তাহে বাংলাদেশ থেকে দেড়শ, উত্তরবঙ্গ থেকে একশ ষাট, বিভিন্ন গ্রাম থেকে তিন হাজার, আর কলকাতা ও মফঃস্বল থেকে আড়াই হাজার চিঠি জমা হয়েছে দরবারে। অবশ্যই সব চিঠির উত্তর দেয়া অসম্ভব। না, সকলের প্রাপ্তিস্বীকারও করা যায় না। কিন্তু কিছুই নাকি ফেলা যায় না, ধৈর্য ধরে পড়া হয়। এবং উপযুক্ত বিভাগে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

'নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা নিয়ে লিখেছেন কলকাতা তিয়াত্তর থেকে কমলেশ সাধু খাঁ। কমলেশবাবু, আপনার চিঠি।' বলে সরোজবাবু, প্রিয়ংবদাকে পড়ার ইঙ্গিত করলেন।

প্রিয়ংবদা পড়লেন 'উনি লিখেছেন "আপনাদের ঘোষণা শুনিয়া কখনো কোন নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে সনাক্ত করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ছোটবেলার ছবি অনেক সময় দেখানো হয়। চুল, চোখের রঙ, কানের গঠন, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি ডিটেলস্ দেয়া হয় না। অনেক সময় এক বছর বা আরো আগে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির পরণে সেই সময় কি ছিল, তাই ইনাইয়া বিনাইয়া শোনান হয়। সেই একই জামাকাপড় কি সে এখনো পরিয়া থাকিবে?" সরোজদা, বসিরহাট, চব্বিশ পরগণা থেকে মলিনা সেনও এই প্রসঙ্গে লিখেছেন... এই যে ওনার চিঠি— পড়ব?— "অনেক সময় ঘোষণায় বলা হয় নিরুদ্দিষ্ট ছেলে বা মেয়ের বুকের বাঁদিকে বা উরুতে জড়ুল আছে। রাস্তায় যদি লোকের সন্দেহ হয়, এর মুখটাই টিভিতে দেখিয়েছিল, তাহলে কি সঙ্গে সঙ্গে তার পোষাক খুলে সনাক্তকরণ চিহ্ন দেখবে? এরকম ঘোষণা থেকে বহু কেলেঙ্কারি হবার আশঙ্কা আছে বলে আমি মনে করি!"

প্রিয়ংবদা থামতে সরোজবাবু বললেন, 'বিনা মন্তব্যে আপনাদের চিঠি হাজির করা হ'ল। এবার যাই অন্য প্রসঙ্গে। খবরের ভুল। বীরভূম থেকে বিমলেন্দু দাস, বারুইপুর থেকে কার্তিক নস্কর, দাসনগর, হুগলি থেকে রাধানাথ রায়, মণিকা চট্টোপাধ্যায়, ঠিকানা নেই। আপনারা সকলেই লিখেছেন, গত শনিবার সাড়ে সাতটার বাংলা খবরে রাষ্ট্রপতির নাম ভেঙ্কটরমন না পড়ে ভেঙ্কটরাঘবন পড়া হয়েছে। সত্যিই এটা মারাত্মক ত্রুটি! তবে জানেনই তো, মানুষই ভুল করে!— প্রিয়ংবদা, এবার কলকাতা-৯ থেকে সুকন্যা সেনের চিঠিটা পড়া যাক!'

—'হ্যাঁ, সরোজদা। উনি লিখেছেন "আমরা যে ভাবে 'ক্রয়' লিখি, সেইভাবে যদি 'ক্রিপা', 'ক্রিষ্ণ' ইত্যাদি লেখা যায়, তবে র-ফলা এবং রি-ফলা দুটো রাখার ঝামেলা থাকে না। কী বলেন?"

সরোজ— 'আমরা আর কী বলব? এ প্রসঙ্গে সুধী দর্শকদের মতামত আহ্বান করছি এবং অবশ্যই ভাষাবিদ এবং পন্ডিত ব্যক্তিদের অভিমত।'

এরপর দুটো বাংলাদেশের চিঠি। তাঁদের ভীষণ ভাল লাগে কলকাতা দূরদর্শনের অনুষ্ঠান! কিন্তু এ্যান্টিনায় থৈ পাচ্ছেন না!

রিনীর ধৈর্যে চিড় ধরল। নাদু মুচকি মুচকি হেসে ওকে আরো রাগিয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ টিভিতে প্রিয়ংবদা বলল, সরোজদা, এবার একটা বিশেষ চিঠি পেয়েছি। লিখেছেন গাইঘাটা, চব্বিশ পরগণা থেকে মিনতি হালদার। উনি লিখেছেন, "সরোজবাবু, আপনাকে এবারও পদ্মশ্রী দেয়া হ'ল না বলে আমি মর্মাহত। অথচ আপনি কত ভাল বলেন আর, আপনার নামের মানেও তো পদ্ম"!— 'সরোজদা, এর উত্তর আপনাকে দিতেই হবে!'

গোঁফ দাড়ির ফাঁকে স্মিত হাসলেন সরোজ রাহা, বললেন, 'মিনতি দেবী! একটু আধটু পদ্য লেখার বদ অভ্যাস আছে। সবিনয়ে বলি—

মাথা পেতে নেব দর্শকের দরবারে
পুরস্কার তিরস্কার সমান আদরে।
ছোট-বড়-মেজ-সেজ সরকারি খেতাব,
তার তরে মন আমার নয়তো বেতাব!'

প্রিয়ংবদা দু'চোখে প্রশংসা জ্বেলে বলল, 'বাঃ, সরোজদা অপূর্ব।

সরোজ— 'আমাদের কিন্তু সময় হয়ে গেছে। সবাই ভাল থাকুন! যাবার আগে ছোট্ট বন্ধু অভিনব'র একটা ছবি দেখাই।

খড়্গপুর থেকে ও এঁকে পাঠিয়েছে, একজন সমাজবিরোধী বৈদ্যুতিক তার কাটছে। অভিনব, আশা করি তোমার— ছবি দেখে এ ধরণের অপরাধী লজ্জা পাবে!'.....

'বোগাস!' —রিনী এক আঙুলের ঝাপটায় টিভির প্রাণহরণ করল।

গ্রাহক হবার আবেদন পত্র

সরস কার্টুন

নাম _____

ঠিকানা _____

_____

_____

_____ পিন কোড নং _____

আমাকে _____ সংখ্যা থেকে এক বছরের জন্য 'সরস কার্টুন'-এর গ্রাহক করে নেবেন। এই সাথে নগদে/ মানি অর্ডার/ব্যাঙ্ক ড্রাফট মারফৎ *পূজা সংখ্যা বাদে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য পঞ্চাশ টাকা / *পূজা সংখ্যা সহ বার্ষিক গ্রাহক মূল্য পঁচাশি টাকা পাঠালাম।

মানি অর্ডার রসিদ/ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ নং _____ তারিখ _____

_____

*যেটি প্রযোজ্য নয় সেটি কেটে দিন।

স্বাক্ষর

'সরস কার্টুন' এর বার্ষিক গ্রাহকরা এক বছরে যে ক'টি সাধারণ সংখ্যা প্রকাশিত হবে, গ্রাহক মূল্যের মধ্যে শুধুমাত্র সেই ক'টি সংখ্যাই পাবেন। বিশেষ বা পূজা-সংখ্যা গ্রাহক মূল্যের মধ্যে ধরা নেই। এক বছরে ১২টির চাইতে কম সাধারণ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। অতএব বার্ষিক গ্রাহক মূল্য অর্থে *১২টি সাধারণ সংখ্যা নয়।*

—সম্পাদক : সরস কার্টুন

DIELES FORGE LIMITED

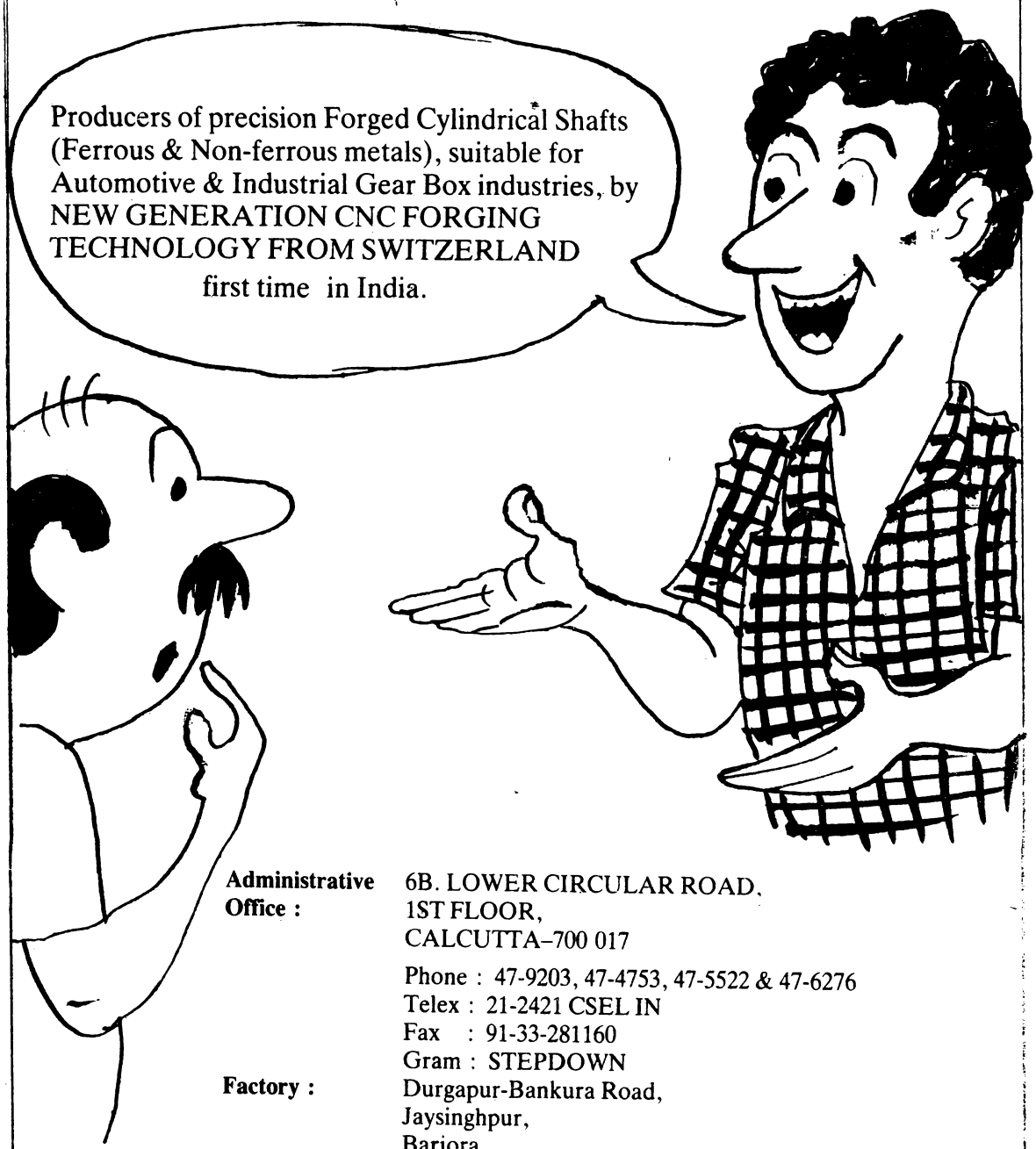

Administrative Office : 6B. LOWER CIRCULAR ROAD,
1ST FLOOR,
CALCUTTA–700 017

Phone : 47-9203, 47-4753, 47-5522 & 47-6276
Telex : 21-2421 CSEL IN
Fax : 91-33-281160
Gram : STEPDOWN

Factory : Durgapur-Bankura Road,
Jaysinghpur,
Barjora
Dist. Bankura, West Bengal.

বিশ্ববরেন্য শিল্পী সত্যজিৎ রায়ের ২৩শে এপ্রিল ৯২তে অকাল-প্রয়াণে সারা বিশ্ববাসীর সাথে আমরাও শোকাহত। তাঁর শোকাহত পরিবারবর্গকে আমাদের সহানুভূতি জানাই আর কামনা করি তাঁর আত্মার চির শান্তি।

প্রকাশিকা ও সম্পাদক
সরস কার্টুন

গুপ্তচর পটলা আর গদাইয়ের মতলব দিল্লীওয়ালাদের বললো
তাই তো! কি করে ওদের ঠাণ্ডা করা যায় বল তো?
কোনও চিন্তা নেই। শুধু গদাইকে তুলে আনো ব্যাস!
রাত্রে ওরা ক্লোরোফর্ম দিয়ে গদাইকে অজ্ঞান করে কিডন্যাপ করলো . . .

SARAS CARTOON : MAY 1992 : PRICE : Rs. 5.00

REG. NO. RN 48276/90 : POSTAL REG. NO. WB/SC-304

হাসির একমাত্র মাসিক পত্রিকা ....

বিরস বঙ্গের

সরস কার্টুন

বারো থেকে বিরানব্বই

সবার সমস্যাময় জীবন-সাহারায়
একখানি হাসির ওয়েসিস !

নিজে একবার পড়লে অন্যকেও পড়াতে চাইবেন
এ গ্যারান্টি দিচ্ছি !!

স্টলে খুঁজুন
হকারকে দিতে বলুন

অসাধারন এই পত্রিকার কোনও বিকল্প নেই !

আপনার এলাকার এজেন্টকে বলুন আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে যাতে নিয়মিত তার কাছ থেকে পত্রিকা পেতে পারেন।

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের চর্চার স্বার্থে আপনার সাহায্য চাই।

সরস কার্টুন

৬৯-জি, সেলিমপুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩১ ফোন : ৪৬-৫৭৪১

একমাত্র স্বত্বাধিকারিনী ডাঃ অপরাজিতা রায়চৌধুরী কর্তৃক আখবার-এ-মাসরিক ওয়েব ইউনিট, ১২, দরগা রোড, কলিকাতা-৭০০ ০১৭ হইতে মুদ্রিত এবং ৬৯-জি, সেলিমপুর রোড, কলিকাতা – ৭০০ ০৩১ (৪৬-৫৭৪১) হইতে প্রকাশিত।